চিত্র-বিচিত্র।

উমেদার।

আমি উমেদার। তিন বৎসর ধরিয়া উমেদারি করিতেছি। চেষ্টার ত্রুটি নাই, হাঁটাহাঁটির কসুর নাই, কিন্তু কিছু জুটে নাই। শুনা ছিল, রাজধানীতে কাজকর্ম্মের বড় সুবিধা, তাই কলিকাতায় আসিয়াছি। জানা ছিল, মাতুল-মহাশয় কলিকাতায় একটা বড়-রকমের কাজ করেন, দুই-একটা ভেকান্সিও নাকি তাঁর হাত দিয়া যায়, তাই সেই আশায় ভর করিয়া মামার স্কন্ধে চাপিয়াছি। কিন্তু এ-হেন মণিকাঞ্চন-যোগেও আমার এ পর্য্যন্ত কোন

সুবিধা হইল না। অনেক কাজকর্ম্ম খালি হইল, সই-সুপারিশ, তা-ও সাধ্যমত জুটাইলাম, দুই-এক-স্থলে আশাও পাইলাম, কিন্তু কেমন পোড়াকপাল, জুটে জুটে করিয়া আজ পর্য্যন্ত কিছু জুটিল না। আমি বেকার!

বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়াছিলাম। শুনিয়াছি, পিতৃদেব উপার্জ্জন মন্দ করিতেন না, দান-ধ্যানে ও আর আর সদ্ব্যয়ে তাঁর নামযশও বেশ ছিল। এখন ঐটুকুই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, কিন্তু তাতে ত আর পেট ভরে না। পাঁচ-দশ বিঘা জমীজমা ছাড়া সামান্য অর্থ ও অলঙ্কার ছিল, দু ভগ্নী—দুটির বিবাহেই তা প্রায় শেষ হয়। মার কষ্ট ও সংসারের অবস্থা দেখিয়া আঠার-বৎসর বয়-সেই আমাকে লেখা-পড়া ছাড়িতে হইল, তার পর উমে-দারি-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, কিন্তু আজ এই তিন বৎসরেও এ সাগরের কূল-কিনারা দেখিতেছি না।

বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে মা, বিধবা পিসি, আর দুটি ভগ্নী ও একটি ভাই। ভগ্নী-দুইটি বিবাহের পর হইতে অধিকাংশ সময় শ্বশুরালয়ে থাকেন, বাকী পরিবারবর্গের অভিভাবক এখন আমি, কিন্তু আমি বেকার!

মামা কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য

করিতেন। বাবা মামাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন, উপস্থিত কর্ম্মের সোপানও নাকি তাঁহা হইতে। ভগ্নীর প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াই হোক্, অথবা কৃতজ্ঞতার খাতিরেই হোক্, মামা পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমার সংসারে কিছু-কিছু সাহায্য করিতেন; কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সংসার পরিগ্রহ করার বছর-দুই পর হইতে খরচপত্রের টানাটানিতে মামা আর কিছুই সাহায্য করিতে পারেন না।

কিন্তু গরজ বড় বালাই, মামার খরচপত্রের টানাটানি বুঝিয়াও আমাকে মামার বাসায় থাকিতে হইল। মামা কিছু আশা-ভরসাও দিলেন, আমি সেই সাহসে, তাঁর সেই অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও, তাঁর গলগ্রহ হইয়া বসিয়া-বসিয়া তিন বৎসর কাটাইলাম—সাধে কি বলিয়াছি, গরজ বড় বালাই!

মামার প্রথম পক্ষের একটি পুত্র আর এক কন্যা। কন্যা শ্বশুরবাটী ভবানীপুরেই প্রায় থাকেন, কখন-কদাচিৎ এ বাসায় আসেন, কিন্তু দু'দিনের বেশী কখনও থাকিতে দেখি নাই। ছেলেটির বয়স দশ-এগার, নাম তার রাজন্। দিদিমা রাজন্‌কে বড় আদর দেন, পাছে সেই আদরে ছেলেটি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে দিদিমাকে কলিকাতার বাসায় রাখা হয় না, তিনি বাটীতেই থাকেন।

কলিকাতার বাসার অন্যান্য পরিবারের মধ্যে নূতন মামী, আর তাঁর তিনটি সন্তান। মামীর মাসী, মামীকে "মানুষ" করিয়াছেন, তাঁর কাছছাড়া থাকিতে পারেন না, তাই তিনি মামীর কাছেই থাকেন! আর মামীর একটি ভাই, সে রাজনের বয়সী, মামীর বড় ন্যাওটো, সুতরাং এইখানে থাকিয়া লেখাপড়া করে। মা এখানে, বাটীতে রাঁধিয়া দিবার লোক নাই, কাজেই মামীর মাস্‌তুতো ভাই, মামীর চেয়ে বছুর-পাঁচের বড়, সেই মাস্‌তুতো বড় ভাইটি এই পরিবারশ্রেণীভুক্ত। তিনি বিবাহিত ও সপুত্রক, অতএব তাঁর দারাসুতও অধিকাংশ সময় এইখানেই থাকেন।

মামী ছেলেগুলিকে একলা সাম্‌লাইতে পারেন না, সেজন্য চাকর-চাকরাণীর সংখ্যা কিছু অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইয়াছে, একজন পাচকও আছেন।

মামী তাঁর বাপ-মায়ের বড় আদরের মেয়ে। প্রতি মাসকাবারেই মামীর পিতা নিয়মিতরূপে মামীকে দেখিতে আসেন; এই বৃহৎ সংসার ফেলিয়া, ঘরের গিন্নি মামী বড়-একটা বাপের বাড়ী যাইতে পারেন না, কাজেই মামীর মা-ও মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখিয়া যান।

মামীর সেই মাস্‌তুতো ভাইটি আমার আসার ৩।৪ বৎসর

পূর্ব্ব হইতেই এখানে আছেন, কিন্তু চাকরীর উপর তাঁর বড় বিতৃষ্ণা, স্বাধীন জীবন বহন করিবার ইচ্ছা তাঁর একান্তই বলবতী, তাই আর তিনি কাজকর্ম্মের চেষ্টা করেন না। চাকর-চাকরাণীরা বড় চুরি করে, সেইজন্য বাসার বাজার করার ভার তাঁর উপর, তিনি কিছু বেশী খরচ করেন বটে, কিন্তু হ'লে কি হয়, চাকরেরা ত আর চুরি করিতে পারে না।

বড় ঝঞ্ঝাট বলিয়া টাকাকড়ি মামা নিজের হাতে কিছু রাখেন না। পূর্ব্বে মামার কিছু বাজে খরচ ছিল, অনর্থক দানে ও আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্যে মাসে মাসে তাঁর প্রায় ২০।২৫ টাকা অপব্যয় হইত, মামীর সুবন্দোবস্তে সে খরচটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

আমার আফিস নাই, সুতরাং সারাদিনই অবকাশ। আমার কলিকাতায় আসার দিন-পনের পরে একদিন মামীর মাসী কথায় কথায় আমায় বলিলেন, "দেখ সুরেন, একটা কথা আজ ক'দিন ধরে' এঁরা কেউ তোমায় বল্‌তে পাচ্ছেন না—জামাই, কামিনীকে (মামীর নাম কামিনী) রোজই তোমায় বল্‌তে বলেন, কিন্তু সে ত ভাই ভেবেই খুন—কি করে' তোমায় বল্‌বে। সে বলে, ও কথা আমি কেমন করে'

সুরেনকে বলি, পাছে সে কিছু মনে করে। আরে বাছা, সুরেন তো তোর ঘরের ছেলে, তাকে আবার লজ্জা কি? কেমন কিনা ভাই! আমি বল্লেম, তোমরা কেউ না পার, আমিই বল্‌ব এখন, সুরেন তেমন ছেলেই নয়, শুন্‌বামাত্র সে হাসিমুখে স্বীকার হবে।" আমি অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই ভূমিকা শুনিতেছিলাম, তিনি সমান বলিয়াই চলিলেন, "তোমার মামা বলেন কি—রাজনের ত পড়াশুনা ভাল হচ্চে না, যে মাষ্টারটি আছে, সে-ও তেমন যত্ন করে' পড়ায় না, হাজার হোক, সে ত পর বই নয়; তা তুমি যদি একটু মনোযোগ কর, তবেই তোমার ভাইটের কিছু হয়। রাজনের জন্য তোমায় আর বেশী বল্‌তে হবে না, তার যাতে ভাল হয়, তুমি তাই কর, তোমার মামা ত তোমার উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্তি! আর গোপাল তোমার মামীর ভাই, সে-ও ত কিছু তোমার পর নয়, তাকেও একটু দেখো।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে তার আর কথা কি!" তিনি অম্‌নি মামীর দিকে নয়নপল্লব বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লি লো কামিনি,—তুই আবার ভাব্‌ছিলি পাছে সুরেন কিছু মনে করে, হ্যাঁলা, তুই কি সুরেনের তেম্‌নি মামী যে,—" ইত্যাদি।

পরদিন মামা আমায় বলিলেন, "হ্যাঁ হে, তুমি নাকি বাড়ীর মধ্যে ওদের কাছে বলেছ,—মাষ্টার রাজনন্দের ভাল করে' পড়ায় না, তুমিই এখন হ'তে ওদের পড়াবে? সে ত ভালই, তুমি ভার নিলে ছোঁড়াদের কিছু হ'তে পারে।"

পরদিন হইতে দশ-টাকা-বেতনের মাষ্টার-মহাশয় বিদায় পাইলেন। আমিই রাজনন্দের নিয়মমত পড়াইতে লাগিলাম। মামার এ পক্ষের ছেলে ও মেয়েটি দুপুরবেলায় পণ্ডিতের কাছে পড়ে, আমার আসার পর মাস-খানেক-দেড় এই বন্দোবস্তেই কাটিয়া গেল। একদিন শুনিলাম, ছেলেরা বাহানা ধরিয়াছে, "পণ্ডিতমশায় মারে, আমরা সুরেন-দাদার কাছে পড়্‌ব।" পণ্ডিত আসিয়া দুই দিন ফিরিয়া গেল, ছেলেরা আর পড়িতে আসে না, তাদের সুর সেই সমানই চলিয়াছে—"আমরা সুরেন-দাদার কাছে পড়্‌ব।" পণ্ডিত কিন্তু রোজই আসে, সাত টাকার মায়া সে বেচারি সহজে ত্যাগ করিতে চায় না—বুঝি পারেও না। মামী স্বয়ং একদিন আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু ভারি এক মুস্কিলে পড়েছি; তোমার ভাই-বোন-দুটি কি চোখেই যে তোমায় দেখেচে, সুরেন-দাদা সুরেন-দাদা করেই তারা

সারা! আবার ক'দিন থেকে খোট ধরেছে, ওরা তোমার কাছে পড়্‌বে,আর কারুর কাছে পড়্‌তে চায় না। কি করি বল দেখি, পাছে তোমার কষ্ট হয় বলে' আমি ত তোমায় ক'দিন বলিইনি, তাড়াতুড়ি দিয়ে মেরে-ধ'রে কিছুতে যদি ওদের ভুলুতে পাল্লেম।" আমি কি-একটা উত্তর দিতে যাইতেছি, এমন-সময় কোথা হইতে মামীর মাসী হরিনাম জপিতে জপিতে বলিয়া উঠিলেন, "তা পড়াবে গো স্থরেনই পড়াবে, ওকে ত আর কোথাও বেরুতে হয় না, দুপুরবেলায় খেয়ে-দেয়ে শুয়ে কাল কাটায়, তা-না-হয় ওদের নিয়ে দুদণ্ড বস্‌বে, এ আর বেশী কি! কেমন স্থরেন!"

এর পর হইতে ছোট ছোট ছেলেদেরও আমি পড়াইতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ মামা কিছু সকাল-সকাল আফিস হইতে ফিরিলেন, তখন আমি ছেলেদের পড়াচ্চি। মামা বল্লেন,"কই আজ পণ্ডিত আসেনি?" আমি যথাবিহিত উত্তর দিলাম। মামা বলিলেন, "বটে, তুমি ত হে দেখ্‌ছি অনেক খরচ বাঁচাও, আচ্ছা আস্‌চে মাস হ'তে এখন থেকে দিদির কাছে কিছু-কিছু পাঠাব, দিদির ভারি কষ্ট, না? আমার টানাটানি বলেই ত এতদিন কিছু পাঠা'তে পারিনি!" মামার এই প্রস্তাবে কিছু আহ্লাদিত হইলাম,

ভাবিলাম, মায়ের কোনরূপে সাহায্য হ'লে আমিও নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে পারি।

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি-একটা প্রয়োজনে উপরে গিয়াছিলাম, নীচে আসিতেছি, এমন-সময় শুনিলাম, মামীর মাসী পাশের ঘর হইতে যেন কাকে বলিতেছেন, "ভিজে বেড়ালকে চেনা ভার, বসে' বসে' পাত্ড়া মার্বেন, আর মামার কাণ ভারি কর্বেন, ধন্য কলিকাল যা হোক! মামাতো-ভাইদের পড়িয়ে টাকা নিতে লজ্জা করে না! পোড়াকপাল আর কি!" কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম, কেন না জানিতাম, "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!" বেকারের মত সহিষ্ণু জীব বুঝি আর দুটি নাই! কবিরা বোধ হয় বেকারের মর্ম্ম জানেন না— নতুবা এহেন দ্বিপদ বেকার থাকিতে সহ্যগুণের উপমার জন্য চতুষ্পদের শরণ লইবেন কেন?

তার পর দিন-দুই গেল, মামা আর কোন কথা আমায় বলেন না, যেন কিছু লজ্জিত-লজ্জিত। একদিন হঠাৎ আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "তাই তো হে সুরেন! দিদির ত দেখি ভারি কষ্ট, তাঁর কাছে কিছু পাঠা'বার বড়ই দরকার, তা এক কাজ কর, একটা প্রাইভেট্ টিউশনি

দেখ, তাতে যে ক'টা টাকা পাবে, তাই দিদিকে পাঠালেই চল্‌বে, তাঁর পর যা হয় কর্‌ব!" মামার বিপদ্‌ বুঝিয়া বড় দুঃখেও মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, প্রণয়-স্রোতে মামার আমার আজ লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

আমি পূর্ব্ব হইতেই একটি প্রাইভেট্‌ টিউশনির জোগাড় দেখিতেছিলাম, সেই দিন হইতে আরও একটু বেশী-বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলাম। উমেদারের সহিত ছোট-বড় অনেক লোকেরই আলাপ, কোন পদস্থ ব্যক্তির সহিত বোধ হয় এত লোকের আলাপ হয় না। সবেমাত্র "সেশন্‌" খুলিতেছে, কাজেই আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না, শীঘ্রই একটি টিউশনি জুটিল, বেতন বার টাকা। তখন হইতে বাড়ীতে মার নিকট মাসে মাসে দশটি টাকা পাঠাইতে লাগিলাম, অনেকটা অভাব ঘুচিল। আমি কতক নিশ্চিন্ত হইলাম, মামাও বাঁচিলেন।

এই বাংলাদেশে আমাদের মত বেকারের অন্ন জুটিতে না পারে, কিন্তু পাত্রী জুটিতে বাকী রয় না, সব বন্ধ থাকে, কিন্তু বিবাহ বন্ধ থাকে না। আমার সম্বন্ধ জুটিল, বিবাহও হইল। সবেমাত্র কাজের চেষ্টায় আসিয়াছি,

তখনও দেহভরা উদ্যম, বুকভরা আশা, মনভরা উৎসাহ, তবু সে সময়ে আমি বিবাহের প্রস্তাবে প্রথমে অমত করিয়াছিলাম, কিন্তু মামার অনুরোধে আমাকে মামীর বেগুনফুলের কন্যার সহিত উদ্বাহবন্ধনে (উদ্বন্ধনে মনে করিবেন না) বদ্ধ হইতে হইল।

বিবাহের পর বারতিনেক শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম। শেষবার শ্বশুরমহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাবাজি, একটা কাজ-কর্ম্ম কর, এমন নিশ্চিন্ত থাকাটা ত আর উচিত হয় না।"

বড়-ঠাকুরঝি বলিয়াছিলেন, "শুন্‌ছি নাকি তুমি খুব ফেরাই মেরে মেরে বেড়াচ্ছ, পুরুষমানুষ দু'পয়সা উপার্জ্জন না কল্লে কি মানায়!" ইত্যাদি।

আমি বেকার বসিয়া আছি, সকলেই জানেন, আমার অনেক সময়। আত্মীয়-মুরুব্বিগণ সকলেই বলিতেন, "এ বয়সে বসে' থাকা কিছু নয়, যাতে-তাতে ঢুকে পড়;" সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন, শেষে কেহ বা অনুগ্রহ করিয়া দুই-চারিটা ফাইফরমাস্ আমার উপর চাপাইতেন। সে ফরমাস্ নানা রকমের, সে সব সামান্যই কাজ——না করিয়া দিলে চলে না, আপত্তি খাটে না। একদিন ট্রামে আসিতেছিলাম, ট্রান্সফার্ টিকিট্ ছিল;

বৌবাজারের চৌমাথায় নামিলাম। দেখিলাম, একটি ঘোড়ার বড় নাকাল, তার কাজও নাই, কামাইও নাই। যতগুলি গাড়ি আসিতেছে, চৌমাথার বাঁক পার হইবার সময় সেই ঘোড়াটিকে অতিরিক্তরূপে জোতা হইতেছে, সে বেচারি সর্ব্বদাই এরূপ করিতেছে, কিন্তু তার কাজ কোন কাজের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে। তার বিশ্রামের গৃহ নাই, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রৌদ্রে পুড়িতেছে! তার অবস্থা দেখিয়া একবার নিজের অবস্থা মনে পড়িয়াছিল।

আমি প্রায়ই কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বড় বড় চাকুরের, বড় বড় জমীদারের, বড় বড় মুরুব্বির বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই। বিশেষত রবিবারে ত আমার সকাল-বিকাল কামাই থাকে না। মাঝে মাঝে আফিস-অঞ্চলেও যাই, আফিসে গিয়া আশা পাইয়া কোন কোন দিন বা 'বাবু'দের বাড়ীতে যাই। সেখানে গিয়া কোন বাবুর সাক্ষাতের আশায় ঘণ্টা-কয়েক অপেক্ষা করিয়া শুনিতে পাই, "বাবু আজ বড় ব্যস্ত, আর একদিন আস্‌তে বল্লেন।" কোথাও বা সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং বাবুর দর্শনলাভ ঘটে, কিন্তু ফলটা প্রায়ই একরূপই দাঁড়ায়। কোন কোন বাড়ীতে অধিক কষ্ট করিতে হয় না, দরোয়ান্‌জীর অনুগ্রহে নগদ-নগদ বিদায়

পাই। আমি কিন্তু আশা ছাড়ি না, বাবুদের নিকট যাওয়া-আসা বন্ধ করি না। যদি কখন কেহ আমার এই-রূপ যাতায়াতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি তখন মনে মনে নিধুবাবুর সেই গানটি ভাবি——

"তাইতে তোমায় দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসি না।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি না।"

তার পর ঘুরিয়া-ফিরিয়া যখন বাসায় যাই, তখন বেলা কিছু বেশী হইয়া পড়ে। বাসায় যাইয়া শুনি, চাকর-চাকরাণীরা আমার সম্বন্ধে নানারূপ মিষ্ট আন্দোলন করিতেছে। আহার করিতে গিয়া দেখি, ভাত বাড়া রহিয়াছে, চালের সহিত তার আর প্রভেদ করা যায় না। কোনদিন বা দেখিতে পাই, অন্নপাত্রের উপর কুকুর-বিড়াল ও বায়সবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের বল-বুদ্ধির পরীক্ষা করিতেছে।

মধ্যে মামার আফিসে একটি কাজ খালি হইয়াছিল, মামার কথায় বুঝিয়াছিলাম, সে কর্ম্মে মামার বিশেষ হাত ছিল। মামার এক জ্ঞাতি-ঠাকুরদাদা আছেন। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর বাসা। তিনি মামার নিকট প্রায়ই আসিতেন। লোকটি বড় ভাল, কিন্তু কিছু স্পষ্ট-বাদী, অন্যায়টা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তিনি আমায়

কিছু স্নেহ করিতেন, আমার জন্য মাঝে মাঝে উপরপড়া হ'য়ে মামাকে বলিতেন-ও। এক্ষণে এই কাজটির কথা শুনিয়া মহা-আনন্দ-সহকারে মামাকে বলিলেন, "দেখো ভাই, এটা যেন আর সুরেনের ভাগ্যে ফস্কায় না।" মামা উত্তর করিলেন, "না, এটা বল্‌তে গেলে একরকম আমার এক্‌তারেরই মধ্যে।"

দুই দিন যেতে না যেতে দেখি, মধ্যাহ্নে ব্যাগ্‌হস্তে মামার এক সম্বন্ধী উপস্থিত—ইনি মামীর সহোদর এবং কনিষ্ঠ। জানি না কেন তাঁহাকে—তাঁহার সহিত সম্বন্ধটা ঠিক করিতে পারিতেছি না—কেন তাঁহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল! বুঝি নিশীথরাত্রে কারাগৃহে নবাবপুত্রী আয়েসাকে নির্জ্জনে জগৎসিংহের নিকট দেখিয়া ওসমানের হৃদয় এমনই কাঁপিয়াছিল! সেই দিন মাতুল-মহাশয় যখন আফিস হইতে ফিরিলেন, আমি তখন কার্য্যান্তরে উপরে ছিলাম। দেখিলাম, মামা ঘরে যাইবামাত্র, পাখাহাতে মামী, তাড়াতাড়ি, মামার চাপ-কানের বোতাম খুলিয়া দিতেছেন, আমি অন্তরালে ছিলাম, হঠাৎ এ ঘটনাটি আমার চক্ষে পড়িল। মামার চক্ষের সেই সহাস্য দৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গের সেই আবেশময় সৃষ্টি,

আর মুখের সেই প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বুঝি এ সুখসম্ভোগ মামার পক্ষে বড় সুলভ নহে।

পরদিন একটু সকাল-সকাল মামা আফিস চলিয়া গেলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার আফিস যাইবার কথা। মামা কিছু না বলায় ভাবিলাম, তাড়াতাড়িতে বুঝি বা ভুলে গেছেন; মামার আফিস চিনিতাম, আহারান্তে আফিসে গেলাম। গিয়া দেখি, মামা বড়সাহেবের সহিত তাঁর সেই সম্বন্ধীটির পরিচয় করাইয়া দিতেছেন, সাহেব একমুখ হাসিয়া মামার সম্বন্ধীর পিঠ চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে মামার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "Oh! your own Rascal!" মামাও টিপিটিপি হাসিতেছেন, কেবল মামার সম্বন্ধি-বেচারা যেন কিছু অপ্রতিভ-অপ্রতিভ! মামা আমাকে দেখিতে পান নাই, আমি সরিয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইলাম। মামা যখন সাহেবের নিকট হইতে সসম্বন্ধী ফিরিতেছিলেন, আমি সম্মুখে পড়িলাম। মামা আর আমার দিকে তাকাইতে পারিলেন না, কেবল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে কাজটা হ'য়ে গেছে!"

আমি একটু রাত্রি করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় গিয়া দেখি, মামার সেই ঠাকুরদাদা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা!

মামাকে বলিতেছেন, "বলি, একেবারেই কি গোল্লায় গিয়েছো! চোখের চামড়াটাও কি নাতবৌয়ের পায়ে দিয়েছো! সুরেনের বাপ তোমাকে মানুষ করে' কাজকর্ম্ম করে' দিয়েছিলেন, তুমি তাঁর সম্বন্ধী, তাই বুঝি তুমিও তেম্‌নি নিজের সম্বন্ধীর কাজ করে' দিয়ে সে উপকারের শোধ দিলে! অতি উত্তম কাজই করেছো!" ব্রাহ্মণ উঠিয়া চলিয়া যান, সম্মুখে আমায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওরে বাপু, এ বাজারে ভাগ্নে হওয়ার কর্ম্ম নয়, পারিস্ তো আর জন্মে মামার দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধী হ'য়ে উমেদারি করতে আসিস্, এখন ঘরের ছেলে ঘরে যা।"

বৃদ্ধের বচন গ্রহণযোগ্য হইলেও, এ ক্ষেত্রে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। আমি এখনও সেই কলিকাতায় মামার বাসায় উমেদার!

কেরাণি-জীবন।

বাবু রামকিঙ্কর রায় ইংরাজি-বিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু খাঁটি হিন্দু। দুষ্ট লোকে বলে, প্রথম বয়সে নাকি তাঁর কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, কিন্তু যে যা' বলে বলুক, এখন রামকিঙ্কর-বাবুর মত হিঁদু মেলা ভার।

রায়মহাশয় বাল্যবিবাহের বড় পক্ষপাতী। তবে এ কথাও তিনি বলিতেন, অভিভাবক দূরদর্শী না হইলে, বাল্যবিবাহে কিছু কুফলও ফলিতে পারে; বিজ্ঞ রায়-মহাশয়ের কিন্তু সে ভয়টুকুও ছিল না; তাই তিনি এক দশমবর্ষীয়া বালিকার সহিত স্বীয় ষোড়শবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ নলিনীকান্তের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রায়মহাশয় কলিকাতায় কাজ করিতেন, কাজ-কর্ম্মের অবস্থা ভাল, পরিবারবর্গ কাছেই থাকিত।

নলিনীকান্তের বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত

হইয়া গিয়াছে; এই তিন বৎসরে রায়মহাশয় পুত্রবধূকে অনেকবার আনাইয়াছেন, কিন্তু বালক পুত্রের সহিত বালিকা বধূর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যাহাতে কোন আলাপ-পরিচয় না ঘটে, তদ্বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় সতর্ক। তিনি জানিতেন, বাল্যবিবাহরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রের কলঙ্কই ঐটুকু।

কিন্তু মেয়েরা এতটা বুঝে না, তা'রা লুকাইয়া লুকাইয়া মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে বধূকে নলিনীর ঘরে দিয়া আসিত। এ সব কিন্তু বিজ্ঞ রায়মহাশয়ের কাণে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন সময় বুঝিয়া, গৃহিণী রায়মহাশয়কে বলিলেন—"আর শুনেছ! আমাদের বউমা যে পোয়াতী।" কথাটা শুনিয়া রায়মহাশয় সহসা চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে গৃহিণীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ!—বউমা!—আমাদের নলির বউ!" রায়মহাশয়ের তথনকার মূর্ত্তিটির ঠিক চিত্র দেওয়া দুরূহ। বুঝি মহিষীর মুখে কন্যার সন্তান-সম্ভাবনা শুনিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতাপাদিত্য এমনি মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। যাহা হউক,এতদিনে বিজ্ঞ রায়মহাশয় বুঝিলেন, চাঁদে কলঙ্ক স্বভাবেরই নিয়ম।

যথাকালে নলিনীকান্তের এক কন্যা জন্মিল। ইহার পর হইতে, ষষ্ঠীদেবী বধূমাতার উপর অসাধারণ কৃপা-বিতরণ করিতে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। দেখিতে দেখিতে রায়মহাশয় পৌত্র-পৌত্রী-পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের লইয়া তিনি বড় আনন্দে দিন কাটাইতেন।

রায়মহাশয় এইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ উপর হইতে তাঁহার তলব পড়িল; হায়! এত সাধের খেলাঘর ফেলিয়া রায়মহাশয়কে অসময়ে যাইতে হইল! পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে নলিনী অকূলপাথারে পড়িল। সে যে এখনও কলেজের ছাত্র! নলিনীর পিতা অনেকদিন হইতেই বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু কই.. তেমন কিছুই ত রাখিয়া যান নাই। এই তরঙ্গভঙ্গময় সংসারসমুদ্রে নলিনী একা,—নিতান্তই একা, কেমন করিয়া সে এতবড় গৃহস্থালী চালাইবে? শেষ সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া সেই অশৌচ অবস্থাতেই তার ৺ পিতৃদেবের বড়-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সাহেব, রায়মহাশয়কে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন, নলিনীকে শীঘ্রই একটি কাজ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

নলিনী তার পর কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে দেশে গেল।

কোনরূপে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া, নলিনী কলিকাতায় ফিরিল। পরিবারবর্গ দেশেই রহিল।

কলিকাতায় আসিয়া নলিনীকে আর বড় কষ্ট পাইতে হইল না। সেই সাহেবের দয়ায় শীঘ্রই একটি কাজ জুটিল, বেতন ত্রিশ টাকা। কাজ পাইয়া নলিনী ভাবিত, "হায়! হায়! শেষ এই ত্রিশ টাকায় জীবন বিকাইতে হইল!" আফিসের অন্য অন্য কেরাণিরা মনে করিল, "নলিনীবাবুর কি জোর কপাল! একেবারেই ত্রিশ!"

নলিনীর নূতন জীবন আরম্ভ হইল, প্রথম-প্রথম চাকুরিতে তার ততটা মন বসিত না! তার আকাশের মত মুক্ত হৃদয়, বায়ুর মত স্বাধীন ভাব, হঠাৎ কেরাণি-গিরির সঙ্কীর্ণ কূপে আবদ্ধ হইতে চাহে না। সে যখন কষ্টে—বহু কষ্টে কেরাণিগিরিতে মন বাঁধিতে চায়, তখনই যেন কোথা হইতে পূর্ব্বস্মৃতির বাঁশী বাজিয়া উঠে, আর মন বাঁধা হয় না। এইজন্যই "ব্রেক্"-কসার প্রয়োজন, বুঝি তাহারই অনুকরণে এপ্রেন্টিসের সৃষ্টি। নলিনীর হৃদয় একটু কাব্য-প্রবণ। এতদিন সে কাব্য ও কবিতা,

ফুল ও জ্যোৎস্না লইয়া মত্ত ছিল। ভাবিয়াছিল, ইহা লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে। কিন্তু একে একে তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙিতে লাগিল। হায়, তবে ত শুধু ঘুমন্ত জোছনার সৌন্দর্য্যে, ফুটন্ত কুসুমের গন্ধে, ছুটন্ত 'মলয়া'র স্পর্শে পেট ভরে না!

নলিনীর কাব্যরসের সহিত অন্য দুই-একটা রসও ছিল, তা'র মধ্যে বীররসই প্রধান। ভারত-জাগান ভাব তাহার অন্তরে অন্তঃসলিলার মত বহিত, সময়ে সময়ে সে রস লেক্‌চার্‌-রূপে উথলিয়া উঠিত। সে কতবার ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে আঁকিয়া ভারত-বাসীর সমক্ষে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। কতদিন সে কৃষ্ণদাস ও সুরেন্দ্রনাথের দেশহিতৈষিতার খুঁৎ ধরিয়াছে। সে দেখাইবে, কেমন করিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। কিন্তু হায়! আজ তাহার সে সব সঙ্কল্প জল্পনায় পরিণত হইল!

নলিনীকান্ত কলিকাতার এক 'মেসে' থাকিতেন। দেশে কিছু 'জমিজারাৎ' আছে, তবু বাড়ীতে মাসে মাসে পনেরটি টাকা না দিলে চলে না। নলিনীর বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর হইলেও, রেলগাড়ীর কল্যাণে,

শনিবারে গিয়া সোমবারে আফিস করা চলে। কিন্তু টাকায় কুলায় না বলিয়া, নলিনীর নিয়মমত যাতায়াত চলে না, মাসে কেবল একবার যাওয়া হয়।

আফিসে বেতনবৃদ্ধির নামগন্ধ নাই, কিন্তু বাটীতে বংশবৃদ্ধি সমভাবেই চলিতেছে। এখন আর পনের টাকায় সংসারখরচ কুলায় না, আঠার টাকা করিয়া পাঠাইতে হয়, কাজেই মাসান্তে একবার যাওয়া, তা-ও বন্ধ করিতে হইল। এখনকার যাওয়া ন' মাসে ছ' মাসে!

কিন্তু এততেও নলিনীর কাব্যরস আজও একেবারে শুকায় নাই। বাহিরের উত্তাপে, পাতালে ভোগবতীর মত, সে রস অন্তরে আশ্রয় লইয়াছে। হায় কবিতা-রোগের কি ঔষধ নাই? এ রোগ একবার ধরিলে বুঝি 'ক্রণিক্' হইয়া দাঁড়ায়। নলিনী এখনও বাছিয়া বাছিয়া শুক্লপক্ষে বাড়ী যায়, বসন্তের শনিবারেও তার কলিকাতায় মন টিকে না! এখনও সে দীর্ঘপ্রবাসের পর মিলনের জ্যোৎস্নারাত্রি চোখে চোখে কাটাইতে চায়। নলিনীর গৃহিণী যখন গৃহস্থালীর কথা বলিতে ব্যস্ত, নলিনী তখন একদৃষ্টে তাঁহার বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে থাকে—কথাগুলা 'মাঠে মারা' যায় দেখিয়া গৃহিণী যখন স্বরলহরী সপ্তমে তুলিয়া বলেন—

"নাও, তোমার পাগ্‌লামী রাখ, আর 'কাব্যিমি' কর্ত্তে হবে না,—চিরকালই কি ছেলেমি ভাল লাগে?" তখন নলিনীনাথ, একটু অপ্রতিভ হইয়া, প্রকৃতিস্থ হন।

নলিনী কর্ম্মে প্রবেশ করার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন তার দুই কন্যা ও তিনটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স নয়-বৎসর হইতে চলিল, দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিবাহ না দিলে নয়। কি উপায়ে সে এ গুরু-ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, নলিনী এখন দিনরাত তাই ভাবে। নলিনীর বয়স আজিও ত্রিশ-বৎসর হয় নাই। কিন্তু সে যখন ছাতা-কাঁধে গোধূলিলগ্নে আফিস হইতে গৃহে ফিরে, তখন তাহার সেই চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি, আর উদাস-মন্থর গতি দেখিয়া মনে হয়, বুঝি অকালবার্দ্ধক্য যৌবন হরিয়া লইয়াছে।

নলিনী যখন প্রথম-প্রথম কর্ম্মে প্রবেশ করে, তখন তাহার 'উপরওয়ালা'র মিষ্ট ভৎর্সনায় বড় ব্যথা পাইত। গুরুমহাশয়ের বেত বড় যন্ত্রণাদায়ক বটে, কিন্তু সে ত শুধু ত্বক্‌স্পর্শী, এত মর্ম্মস্পর্শী নয়। কিন্তু কালে সবই সয়। ক্রমে তার শ্রবণে কড়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তবু এক-

দিন এক নূতন সাহেবের বীভৎস তাড়নায় নলিনীর ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার লুপ্ত বীর্য্য সুপ্ত সিংহের মত জাগিয়া উঠে। তখনই সে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া 'রেজিগ্‌নেশন্' দিতে যায়, অমনি পুত্রকন্যাগুলির মুখ মনে পড়িয়াছিল।—মনে পড়িয়াছিল, আজ কাজ ছাড়িলে, কাল অন্য কর্ম্ম মিলিবে, এমন সম্ভাবনা নাই—তবে কি সব অনাহারে মারা পড়িবে—না, আর কাজ ছাড়া হইল না।

নলিনী একবার অনেকদিনের পর বাড়ী গিয়াছে। গৃহিণীকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জানাইল, "একটা শুভ খবর আছে।" গৃহিণী অমনি উৎফুল্ললোচনে, মহা-আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?" নলিনী একটু রঙ্গ করিবার অভিলাষে বলিল, "কেন, অনেকদিনের পর আমি এসেছি, এটা কি আর সু-খবর নয়?" গৃহিণী যেন একটু বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "নাও, ও সব রঙ্গ রাখ—এখন খবরটা কি খুলে বল।" তখন নলিনী পূর্ণানন্দে বলিল, "আমার সেই লেখাটার ভারি সুখ্যাতি হয়েছে।" ঘোর অবহেলায় গৃহিণী অধরপল্লব কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"এই? আমি বলি মাইনেই বা বেড়েছে!"—

বলিতে বলিতে গজেন্দ্রগামিনী উপেক্ষায় কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। নলিনীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। নিশ্বাস মুক্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

ডাক্তার-বাবু।

রামদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য, বয়সে নবীন, ব্যবসায়ে ডাক্তার। নিজ বল্লভপুরে এবং তাহার আশেপাশে রামদাসের ভারি পশার, ও অঞ্চলে নাকি তার জোড়াটি মিলে না। কিন্তু কেবল ডাক্তারিতেই তার গুজরাণ নয়, সে বহুরূপী। যখন হুঁকাহাতে, খালি গায়ে, শুধু পায়ে, "মাঠ তদারকে" বাহির হয়, তখন সে দাদাঠাকুর; যখন কপালে চন্দন, কাঁধে নামাবলি, হাতে নৈবেদ্য, তখন "পুরুত ঠাকুর"; আবার যখন পোষাক-আঁটা, ঘোড়ায়-চড়া, তখন ডাক্তার-বাবু! তার আরও রূপ আছে, যখন ঢুলুঢুলু নয়নে, স্খলিত বসনে, চঞ্চল চরণে ফেলু শার দোকান হইতে বাহির হয়, তখন সে অপরূপ!

কিন্তু এ-হেন রামদাস-চরিতামৃতের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে লইতে গেলে একটু পূর্ব্বভাষের প্রয়োজন। রামদাসের পিতা ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস নয়-বৎসর বয়সেই পিতার সহকারি-রূপে ব্রতী হন। দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রামদাস। বল্লভপুরের 'গুরুমশায়' যখন জানাইলেন, রামদাসকে আর তিনি পাঠশালায় রাখিতে পারেন না, ত্রিলোচন তখন পুত্রের পরিণামচিন্তায় ব্যাকুল হইলেন! এইরূপে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অকস্মাৎ সম্মুখে কূল দেখিতে পাইলেন। তাঁর এক যজমানের বন্ধুর জামাতা স্বকুমার মৈত্র কলিকাতায় ডাক্তারি করেন। স্বকুমার-বাবু শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, শ্বশুরের অনুরোধে, ত্রিলোচনের আশীর্ব্বাদে বদ্ধ হইয়া, রামদাসকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন; স্বকুমারবাবুর ক্ষুদ্র পরিবার— বন্দোবস্ত হইল, রামদাস তাঁর বাসায় রাঁধিবে, আর স্ববিধা ও 'সাবকাশ' মত পড়াশুনা করিবে। রামদাস এ প্রস্তাবে মহাখুসী, পাড়াগাঁয়ের যে মজা, সে ত তা লুটিয়াছে, এখন সহরের আস্বাদটা আর বাকী থাকে কেন? মহা-উৎসাহে রামদাস নিজের ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি কোমরে বাঁধিয়া

সবে এই সতের-বৎসর মাত্র বয়সে ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। নিজের কলি-হুঁকাটি লইতে ভুলিল না, কিন্তু মনের আনন্দে, বাপ-ভাইকে বিদায়ের প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল।

সুকুমারবাবু রামদাসের গুণগ্রামের পরিচয় কিছু পূর্ব্বে পান নাই। একে একে তিনি দেখিলেন, রামদাস বিনা লবণে দাল রাঁধিতে পারে, ঝাল ব্যতীত মাছের ঝোল রাঁধে, তেল না হইলেও 'ভাজাভুজিতে' তার আপত্তি নাই। প্রায়ই যেথানকার ঝাল-মসলা-লবণ, সেখানেই পড়িয়া থাকে, রামদাস এদিকে অবাধে ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া যায়। এইরূপে ডাক্তার-বাবুর দিনে দিনে আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল, বুঝি বা শাপভ্রষ্ট নল রাজা প্রচ্ছন্নবেশে পাচকরূপে তাঁহাকে ছলিতে আসিয়াছেন!

সুকুমারবাবু তাঁর পুত্র বিমলচন্দ্রকে বলিয়া দিলেন, যেন তিনি রামদাসকে কিছু কিছু পড়ান। বিমল তাহাকে বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠা পড়াইতে পড়াইতে দেখিলেন, তাঁহার ছাত্রের বিশেষরূপ বোধোদয় হইয়াছে! উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, "কেন কেঁচো!" উত্তর শুনিয়া বিমল হাস্য-সংবরণ করিতে না পারায় রাম-

দাস তর্ক ধরিল, বুঝাইল, যাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে, তাহাই যদি উদ্ভিদ, তবে কেঁচো কেন না উদ্ভিদ হইবে?

আজ যাহা পড়িল, কাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "বিলক্ষণ, ও যে পুরোণো পড়া।" এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে রামদাস বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিল। এদিকে বিমল ক্রমে তাহার ছাত্রের বিদ্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। নিজের বিলসরকারী কাজটি দিলেন। নূতন পাচক আসিল, রামদাসের উন্নতি হইল। বেতন তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকায়, বয়স সতের হইতে উনিশে, নেশা অমাক ছাড়াইয়া—ছাড়িয়া নয়—মদে উঠিল। তাহার সেই পল্লীগ্রামের চক্ষু, পক্ষিকুলায়ে ডিম্বের মত, এতদিন কলিকাতার বাসায় আবদ্ধ ছিল, অকস্মাৎ বাহিরের তাপ পাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে এখন চটি ছাড়িয়া বুট ধরিয়াছে, চাদর রাখিয়া সার্ট পরিয়াছে, বেড়ি ফেলিয়া ছড়ি ধরিয়াছে। এইরূপে বিলসরকারী করিতে করিতে অকস্মাৎ তার সেই উর্ব্বর মাথায় আলবার্টের সঙ্গে সঙ্গে কি-একটা ফন্দি জাগিয়া উঠিল। সে তখন নানা উপায়ে কম্পাউণ্ডারের

সহিত সৌহার্দ্দস্থাপনের চেষ্টা পাইল, চেষ্টা বিফল হইল না। সে একে একে কয়টা ঔষধের নাম জানিয়া লইল, ফিবার্-মিক্শ্চার, কুইনাইন্-মিক্শ্চার, তা-ও করিতে শিখিল। মাস-কয়েকের মধ্যে সে বুঝিল, ডাক্তারি-শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে আর তাহার বড় বাকী নাই!

ইহার মধ্যে একদিন শুনা গেল, ডাক্তার-বাবুর একশেট অস্ত্র, একটা ষ্টিথস্কোপ, আর একটা থরমোমেটর পাওয়া যাইতেছে না!

... ...

পিতার সংশয়াপন্ন অবস্থা জানিয়া হঠাৎ রামদাসকে বাড়ী যাইতে হইল। সে গিয়াই পিতার নাড়ী টিপিল, তার পর গম্ভীরমুখে দাদাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "কেন তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইল না? সে নিজে ডাক্তার থাকিতে, তাহার পিতাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে হইল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে?" রামদাস তবু হাল ছাড়িল না, সে কাগজ-কলম লইয়া, তাড়াতাড়ি বাংলায় প্রেস্-ক্রিপ্সন্ লিখিতে বসিল, দশক্রোশ দূর হইতে ঔষধ

আনাইতে হইবে। ত্রিলোচন এই অন্তিমকালে ডাক্তারি-ঔষধ-সেবনে নিতান্ত অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে, রাঁমদাস "প্রেজুডিস্" বলিয়া, নাক সিঁটকাইয়া, অধিকতর গম্ভীর-ভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসিল। ত্রিলোচন অনিমিষ-লোচনে পুত্রের সেই পাণ্ডিত্যগর্ব্বিত বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—'ছেলে আমার ডাক্তার হয়েছে, তবে আর "করে' খাবার" ভাবনা নাই!' তখন বৃদ্ধের আনন্দাশ্রু বহিল, পার্শ্বে ও নিকটে যজমান যে দু-চারি-জন ছিল, তারা ভাবিল, "ছোট দাদাঠাকুর আমাদের ডাক্তারিতে ভারি লায়েক হয়েছে।"

অর্দ্ধঘণ্টা যাইতে না যাইতে ত্রিলোচনের শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইল, ঔষধ আনিবার নিমিত্ত লোক গ্রামের বাহির হইতে না হইতে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

তার পর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া রামদাস আবার কলিকাতায় ফিরিল। যাইবার সময় গ্রামের লোককে আশা দিয়া গেল, আর "বিনা চিকিৎসায়" কাহাকেও মারা যাইতে হইবে না!

বাড়ী হইতে আসিয়া রামদাস মাসখানেক বিলসরকারী করিল। একদিন রাত্রে বিল আদায় করিয়া আনিয়া,

সে ডাক্তার-বাবুর পা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার ব্যাপারখানা জানিতে চাহিলে বলিল, "বিল আদায় করে আন্‌চি, আর মেছোবাজার ষ্ট্রীটে তিন বেটা কাফ্রি আমার কাছ থেকে ৩৭৷৶৹ সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা ছিনিয়ে নিয়েছে।" টানাটানিতে সার্ট ছিঁড়িয়াছে, তা-ও দেখাইল, তাদের হাতে তার নানারূপ দুর্দ্দশা হওয়ার কথাও জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করিল। শেষ বলিল, "কেবল ডাক্তার-বাবুর পুণ্যেই সে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যে যেই তার চীৎকারে লোক জড় হ'য়েছিলো, তাই প্রাণে প্রাণে বেঁচেছে। বুক-পকেটে যে একখানা বিল ও পাঁচটাকার নোট ছিল, তা কিন্তু নিতে পারেনি।" ডাক্তার-বাবু এ ঘটনা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না, ঠিক জানি না, কিন্তু সেজন্য কিছু বলিলেন না,—রামদাস নিজেই বলিল, "সে আর এ কাজ করিবে না—প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে তবে ত উপার্জ্জন!" রামদাস তার পরদিন হইতে বিলসরকারী ছাড়িয়া দিল এবং অন্য কাজকর্ম্মের চেষ্টার জন্য ডাক্তার-বাবুকে বিশেষ-রূপে ধরিল।

দিনকয়েক পরে রামদাসের বাড়ী থেকে এক পত্র এসে উপস্থিত! দেশে অনেকগুলি যজমান, তা ছাড়া

সংসারের কাজকর্ম্মও আছে, দাদা আর একা পেরে উঠ্‌ছেন না। যথাসময়ে এ পত্র ডাক্তার-বাবুকে দেখান হইল, তিনি রামদাসের প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। রামদাস কিন্তু আরও দুইদিন কলিকাতায় রহিল, সে বড়বাজার হইতে ফাইল-চার কুইনাইন, আর টাকা-কয়েকের অন্য অন্য ঔষধও কিনিল। তার পর সেকেণ্ডহাণ্ড দুইখানা চেয়ার্, একটা আল্‌মারি ও একটা টেবিল্‌ও লইল। কোট্‌ পেণ্ট্‌লেন, একটা পুরাতন ঘড়ি, কেমিকেল্‌ গোল্‌ডের একছড়া চেনও কিনিতে ভুলিল না। ডাক্তারির অন্য অন্য যে উপকরণ, সে তা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিতেছিল। একখানা বাংলা ও আর একখানা ইংরাজী সাইনবোর্ড করাইল। ইংরাজিতে R. D.Bhatta. M. P. * এবং বাংলাতে ডাক্তার রামদাস ভট্টাচার্য্য এম্‌, পি, লেখাইয়া লইল। ছোট-বড় অনেকগুলি শিশি এবং বোতল, ছোট ছোট কয়টা সেল্‌ফ্‌, কিছু লাল নীল রংও সংগ্রহ করিয়াছিল। বাটীতে বাহিরের ঘর পরিষ্কার করিয়া, দেয়াল কাটিয়া দুইটা আল্‌মারি করিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই

---

* Medical Practitioner.

করিয়া আসিয়াছিল। রামদাস গ্রামে পা দিতে না দিতে তাহার পোষাকের ছটা, আর আস্‌বাবের ঘটা দেখিয়া, দেশে একটা বিষম হৈচৈ উঠিল। তার পর, আবার সে যখন খালি শিশি ও খালি বোতলে রঙিন জল পূরিয়া আল্‌মারি ও সেল্‌ফ্‌ সাজাইল, সাইনবোর্ড টাঙাইল, তখন একটা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। কেহ মোড়লদের রকে বসিয়া তামাকু খাইতে খাইতে, কেহ স্নান করিতে করিতে, কেহ হাটে যাইতে যাইতে বলিল, "এমনধারা দিগ্‌গজ ডাক্তার এ অঞ্চলে আমরা কখনও দেখিনি!"

দেশে আসিয়াই রামদাস মায় রেকাব-জিন্‌ তের টাকায় এক ঘোড়া কিনিল। এখন রামদাসের চিকিৎসার পালা! রামদাসকে ডাকিতে হয় না, কাহারো ব্যারাম হওয়ার খবর পেলেই সে ধড়া আঁটিয়া চেন্‌ ঝুলাইয়া রোগীর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হয়। রামদাস যখন রোগীর নাড়ী টিপিয়া, দশনে অধর পীড়িত করিয়া, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রোগীর বিবরণ শুনে, তখন কাহার সাধ্য ঠিক করে, ইনি এম্‌-বি, কি এম্‌-ডি! রামদাস বোতল-বোতল ঔষধ দেয়, সময়ে সাবু-মিছরিও জোগায়, কিন্তু দামের বেলায়, রামদাসের কড়া-কড়ি নাই। কেহ আট-দশ-গণ্ডা পয়সা, কেহ পাঁচ-সাত-

পালি চাল, কেহ ধান, কেহ গুড়, যে যা দেয়, রামদাস হাসিহাসি মুখে তাহাই লয়! রোগী যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, রামদাস তখন তাহার সাক্ষাতে সোডা-এসিড তৈয়ার করিতে বসে! ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ শব্দমাত্র রোগীকে উল্লেখ করিয়া বলে, "বাইরে যেমন জোর দেখ্‌চো, ভিতরে গিয়েও ঔষধের এমনি জোর ধরিবে।" শুনিয়া রোগী অবাক্‌ হইয়া যায়, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হয়! কাহারো হাত কি পা ভাঙিয়া গেলে রামদাস তৎক্ষণাৎ "হাওড্রাক্‌সেন্‌ হয়েছে, ফ্রাক্‌সান্‌ করিলেই ভাল হইবে" বলিয়া জলপটি বাঁধিয়া দেয়। অস্ত্রবিদ্যাতেও রামদাস বিশেষ হাত দেখাইতে লাগিল! এইরূপে অচিরাৎ রামদাসের পসারে দেশ ছাইয়া উঠিল; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে একটা ধিধি, একটা টিটি পড়িয়া গেল!

রামদাস আর না ডাকিলে যায় না, টাকা বৈ সিকি-আধুলি লয় না! চাল-ধান-খড়ে আর তার তেমন রুচি নাই!

সুকুমারবাবুর শ্বশুরবাড়ী যে গ্রামে, একদিন সেখান হইতে রামদাসের একটা ডাক আসিল। রামদাসের আর একটা ডাক ছিল, সেইটা সারিয়া আসিতে তার কিছু

বিলম্ব হইল। তার পর রামদাস সেই রোগীর বাড়ী গিয়া দেখে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে,—সর্ব্বনাশ,—স্বয়ং সুকুমারবাবু!

হঠাৎ পকেটস্থ ষ্টিথস্‌কোপ ও থার্‌মোমেটারের দিকে রামদাসের নজর পড়িল, বুঝি, প্রাণটা তার কেমন করিয়া উঠিল!

সম্মুখে তীব্র আলোক দেখিলে উর্দ্ধফণ অহিবিষ যেমন থম্‌কিয়া দাঁড়ায়, অথবা অজাগর-সম্মুখে পক্ষিকুল যেমন নিস্পন্দ হইয়া যায়, প্রথম সাক্ষাতে সুকুমারবাবুর সম্মুখে রামদাসেরও সেই দশা ঘটিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্যপুত্র রামদাস একেবারে বোকা বনিবার পাত্র নহে, সে মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া, ষ্টিথস্‌কোপটাকে পকেটের এক প্রান্তে রাখিল। তার পর তাড়াতাড়ি, হাসিহাসি মুখে সুকুমারবাবুকে সাহেবি-ধরণে নমস্কার করিল, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেও কসুর করিল না! সুকুমারবাবু অভ্যাসবশত প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু হঠাৎ রামদাসকে বড়-একটা চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। তার পর যখন চিনিলেন—তখন বলিয়া উঠিলেন—"আরে কেরে, রামদাস, তুই কোথা থেকে রে"—পার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল—"এজ্ঞে উনি আমাদের বল্লভপুরের ডাক্তার-বাবু।"

সুকুমারবাবু নির্জ্জনে রামদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাঁর কাছছাড়া হইয়া রামদাস কোথাও ডাক্তারি কিছু শিখিয়াছিল কি না, তা-ও সুধাইলেন। রামদাস দুই-চারিটা কথা লুকাইয়া সমস্তই জানাইল; আরও বলিল, "আপনার কম্পাউণ্ডারের নিকট যে দুই-একটা রোগের চিকিৎসা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই রোগকটার চিকিৎসার সময়ই একটু-একটু গোল বাধে, মনে হয়, যেন ভুল হইতেছে, কিন্তু বাকি সব রোগের চিকিৎসা চক্ষু বুজিয়া অনায়াসে করিয়া যাই।" সুকুমারবাবু যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "যাই করিস, দেখিস্, যেন বাড়ীর বা আত্মীয়-বন্ধুর চিকিৎসা করিস্নে।"—তার উত্তরে রামদাস বলিয়াছিল, "আজ্ঞে না—মাতাঠাকুরাণীর কাল হওয়া পর্য্যন্ত আর আপনার লোকের চিকিৎসায় হাত দিই না।"
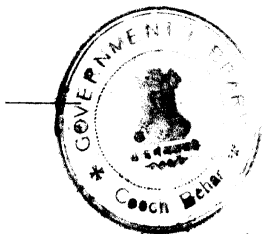
আমার কৃষাণী।

ছেলেবেলা হইতেই ঝোঁক—চাকরি করিব না। পরের এন্তাজারিতে আমি বরাবরই নারাজ। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি এমন-কিছু ছিল না, যাহাতে অনায়াসে দিনপাত হইতে পারে, তবুও যে চাকরির প্রতি এত বিতৃষ্ণা, সে কেবল একটা কারণে। মনে বড় আশা ছিল, হয় ডাক্তার নয় উকীল, দুয়ের একটা হবই হব; আর সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাটাও ছিল যে, ডাক্তারি কিংবা ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই এক লম্ফে স্বর্ণলঙ্কায় পৌছান যায়। কোনরূপে সেখানে পাড়ি জমাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? কিন্তু হায়, বড় আশাতেই ছাই পড়িল, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না, মাঝ-দরিয়ায় পড়িয়া রহিলাম।

এলে পরীক্ষায় ফেল্ হইয়া বড় দাগা পাইলাম। কিন্তু তখনও আশা, একটা কিছু হইতেই হইবে।

এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দেওয়ার পরই আমার বিবাহ হয়। এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যার ভারে আক্রান্ত পিতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য পিতৃদেব তাড়াতাড়ি আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর, আমার সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল। মুরুব্বী-পক্ষ বলিলেন, "ছোঁড়াটা এইবার মাটি হ'ল, ওর বাপ এই বয়সে যে কলসী গলায় বেঁধে দিলে, ওতে কি আর ও মাথা তুল্‌তে পার্‌বে!" এলে পরীক্ষায় ফেল্ হওয়ার পর এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সকলেরই অধিক-মাত্রায় উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমার কথা উঠিলেই লোকে বলিত, "তখনই ত বলেছিলাম, ও ছোঁড়ার কিছু হবে না!" পিতাও বোধ হয় মনে করিলেন, অন্যের ভারটা ছেলের ঘাড়ে চাপাইয়া ভাল করেন নাই, তাঁর পুত্ররত্ন বধূমাতার ভারাক্রান্ত হইয়াই বুঝি পরীক্ষা-পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে।

আমি মহা-লজ্জায় পড়িলাম, একে ত ফেল্-হওয়াই লজ্জার কথা, তার উপর আবার এই টীকাটিপ্পনী—লজ্জার কথায় আর কাজ কি! আমাপেক্ষাও কিন্তু আর একজন অধিক

লজ্জায় পড়িয়াছিল। জানি না, সে বেচারির কি দোষ, কিন্তু সকলেই বলিত, "অত বড় বৌয়ের জন্যই ছেলেটা ফেল্ হ'লো।" রাত্রে ডাগর-ডাগর চোখ-দু'টি আমার মুখের দিকে রাখিয়া বালিকা বলিত, "তুমি ফেল্ হ'লে কেন? পাস্ হও না।" ফেল্-পাস্ কি, সে বিষয়ে বালিকার জ্ঞান কতটুকু, ঠিক জানি না, কিন্তু ফেল্-হওয়াটা যে একটা মহা-কলঙ্ক, ইহা সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিল। বোধ হয়, এটাও তার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, স্বামী কোন একটা ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে যেমন অর্দ্ধাঙ্গিনী হিন্দু-স্ত্রী অর্দ্ধেক ফল পায়, সেইরূপ স্বামীর ফেলের কলঙ্কেও স্ত্রীর অর্দ্ধেক ভাগ। আমি এ কথার কিছু উত্তর 'না দিয়া একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিতাম—

"কলঙ্কে ভয় ক'রো না হ'য়ে আমার দুখের দুখী।"

কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিদ্র-কুম্ভে বারি আনাইয়া শ্রীমতীর কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়াছিলেন; আমিও আমার ভাঙা-মন জোড়া দিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম, আশা—পাস্ করিয়া আমার শ্রীমতীর কলঙ্ক ঘুচাইব। কিন্তু মনের আশা মনেই রহিল। আমার আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিবার

কিছু পূর্ব্বে, পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আর ফিরিতে পারিলাম না। পরীক্ষার পূর্ব্বদিন পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

পরীক্ষা দিবার আশা ফুরাইল! পিতৃদেবের চাকরিই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল, তাঁহার অভাবে সকল দিক্ শূন্যময় দেখিলাম। সংসারের ভার আমার উপর পড়িল, এদিকে কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অচল, চাকরি করিব না—এখন উপায়? বাবা কিছু নগদ্-টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন—একমাত্র সেই অবলম্বন,—কিন্তু তা-ও ত বেশী নয়, মোট দুইহাজার। স্বাধীনচেতা আমি মনে করিলাম, ইহাই মূলধন করিয়া ব্যবসা ফাঁদিব, চাকরি করিয়া দেশের লোকগুলা উচ্ছন্নে যাইতেছে, আমি দেখাইব, কেমন করিয়া নিজের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হয়। দুই-এক-জন আত্মীয়-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যবসা করা যায়?" কিন্তু সদুত্তর কেহই দিতে পারিলেন না। তাঁহারা যাহা বলিলেন, অন্য লোক হইলে, হয় ত দমিয়া যাইত। শেষ আমার স্ত্রীর পরামর্শ লইতে গেলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকের "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী", আর কপালগুণে আমার "বাণিজ্যে রোষতে

লক্ষ্মী!" যাই হোক্, আমি আমার স্ত্রীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাহাত্ম্য অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না। তখন মনে করিলাম, কেবল যে, পথেই নারী বিবর্জ্জিতা, তা' নয়, পরামর্শেও বটে। আমার মন ব্যবসার দিকে ছুটিয়াছে, কোন বাধাবিপত্তি মানিল না; তখন আশা ও স্বদেশানুরাগ বড় প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, স্থির করিলাম, যে যা বলে বলুক, ব্যবসা করিতেই হইবে।

কলিকাতা আসিয়াই পুস্তকের দোকান খুলিলাম। দেড়হাজার টাকায় বিলাত হইতে চালান আনাইলাম। বাকী টাকা অন্যান্য খরচ ও বাংলা পুস্তকের জন্য রাখিলাম। মহা-ধুমধামে ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। প্রথম সেশন্ খুলিতেছিল, বিক্রয় মন্দ হইল না। কিন্তু একটা ভুল হইয়াছিল, বিলাত হইতে কতকগুলি বই বেশী আনাইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, অধিক লাভ পাইব। কিন্তু পরবৎসর কোর্স্ সব বদলাইয়া গেল— অধিকাংশ বই শীঘ্র যে আর বিক্রয় হইবে, এ আশা রহিল না। মূলধন আটক পড়িল, কাজেই পরবৎসর আর বিলাত হইতে চালান আনিতে পারিলাম না। এদিকে কাট্‌তি কম পড়িয়া আসিল, শেষ এস্ট্যাবুলিশ্‌মেণ্ট-খরচা ঘর

হইতে দিতে হইতেছে দেখিয়া, দোকানটি জলের দামে বিক্রয় করিলাম। দুইহাজার টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলাম, এখন সব বেচিয়া পাঁচশত টাকাও হইল না। কিন্তু ইহাতেও একেবারে হতাশ হইলাম না, দুই-একবার লোকসান না দিয়া কি লাভ হয়? এক বারেই কে কোন্ কালে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিয়াছে? এবার ঠিক করিলাম, কাপড়ের ব্যবসা করিতে হইবে। এক-জন অংশীদারও জুটিল, ঠিক হইল, দুইজনে দুইহাজার টাকা দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব। কিন্তু আমার ত অত টাকা নাই, বাকী টাকা কিরূপে সংগ্রহ করি? বিশ-পঁচিশ বিঘা জমী আছে, কিন্তু তা' সব বিক্রয় করিলেও এত টাকা হয় না। স্ত্রীর গহনা যে কিছু না আছে, তা' নয়, কিন্তু সেটা চাই কি করিয়া? আমি এইরূপ ব্যবসা করিতেছি জানিয়া সে কি গহনা দিবে? স্ত্রীলোক ত সহজে গহনা ছাড়িতে চাহে না। তাদের একএকখানি গহনাও আমাদের মত স্বামীর চেয়ে দমে ভারি। গহনা ও সোণার ভারিত্বের প্রতি এতটা বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বোধ হয়, সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে তুলাদণ্ডে চাপাইতে সাহস করিয়াছিলেন। তা সে কথা যাক্, এখন গহনাগুলি

আদায় করি কোন্ ফিকিরে? নানান্ কৌশল ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী রওনা হইলাম। বাড়ী গিয়া প্রথম দুই-চারি-দিন আর কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না। একদিন কথায় কথায় হিন্দু স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধের কথা উঠিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, কৌশলে এ কথাটা আমিই প্রসঙ্গত তুলিয়াছিলাম। কথাটা যখন পড়িল, তখন আর আমায় পায় কে! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া আমি দুঃখ করিলাম, সে দিন আর এ দিনে কত প্রভেদ! এ দেশে স্ত্রীরা স্বামীর জন্য প্রাণ দিতেও কণামাত্র কুণ্ঠিত হইত না, আর এখনকার স্ত্রীরা স্বামীর বিপদ্-আপদ্ কিছুই দেখে না। দলিতা ফণিনীর মত গৃহিণী আমার, এই কথায় জ্বলিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "তোমাদের ওই এক কথা, কই এমন মেয়ে দেখাও দেখি?" আমি কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিলাম, "তা ত ঢেরই আছে, স্বামী টাকার দায়ে জেলে যাচ্চে, আর স্ত্রী এক-গা গহনা পরিয়া আছে, এ ত আকচার!" গৃহিণী দৃঢ় অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "একটিও না।" আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আচ্ছা, তা' দেখাই যাবে।" গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসে?" আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম,

"সম্প্রতি তোমার স্বামীই বিপন্ন, কেমন উদ্ধার কর দেখি!" গৃহিণীও হাসিলেন, বুঝি সে বড় কষ্টের হাসি। হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা' বেশ, কি কর্‌তে হবে বল, এর জন্য আর এত ভূমিকা কেন?" হায়, সরলা আপনার ফাঁদে আপনি পড়িল!

রামচন্দ্র একদিন বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য যদি সীতাকে ত্যাগ করিতে হয়, তা'-ও করিব, কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সত্যই সেজন্য সীতাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সীতাবিসর্জ্জনের সময় রামচন্দ্রের মনে কি হইয়াছিল, জানি না; কিন্তু অলঙ্কার বাহির করিবার সময় গৃহিণীর মুখ দেখিয়া রামচন্দ্রের অবস্থাটা কতক অনুভব করিয়াছিলাম।

গ্রামে গহনা ও জমী বন্ধক দিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ হইল। আবার নূতন উৎসাহে কলিকাতায় আসিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। বন্ধুবান্ধব অনেকেই বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া আমাদের দোকান হইতে কাপড় কিনিতে লাগিলেন—খুব বিক্রি! পূজার পূর্ব্বে দোকান খুলিয়াছিলাম, অল্পদিনেই অধিকাংশ কাপড় নিঃশেষ হইল। দ্বিতীয় চালান আনিবার প্রয়োজন, কিন্তু টাকা কই!

খাতা দেখিলাম, বেশীর ভাগই বিলাত-বাকী। তখন তাগাদা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কেহই 'উপুড়হস্ত' করিলেন না। মহাজনেরা হিসাব-পরিষ্কারের জন্য অস্থির করিল, ধারে বিক্রয় বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আর খরিদদারও তেমন ঘেঁসে না; কিছুদিন দেখিয়া মহাজন আর খাতির করিল না, বাকী কাপড় যা' ছিল, ক্রোক্ করিয়া লইল। তখন মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল,—হায়, সকল আশা ফুরাইল! ব্যবসার বাজার হইতে এতদিনে আমায় দোকানপাট তুলিতে হইল!

আমি লজ্জায় কিছুদিন বাটী যাইতে ইতস্তত করিতেছিলাম, এমন-সময় গৃহিণীর একখানি স্নেহমাখা পত্র পাইলাম, "আমি সব শুনেছি, আর কলিকাতায় কষ্ট করে' আছ কেন, শীঘ্র বাড়ী এস, আমি একটা সংস্থান করেছি।" লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া দেখি, বন্ধকী গহনা বেচিয়া, দেনাপত্র শোধ করিয়া, গৃহিণী জমীগুলি খালাস করিয়াছেন। দুই-একজন আত্মীয়ের সাহায্যে চাস আরম্ভ হইয়াছে। বাড়ীতে এক ঠাকুরাণী-দিদি ছিলেন, তিনি কিছু রহস্যপ্রিয়, আমায় বলিলেন, "নাত্‌বৌ ত লাঙল ধরেছে, এখন তুই আর কি করবি, কাঁধ দে।"

শুনিয়াছিলাম, ব্যবসার অর্দ্ধেক চাস, কথাটা প্রকৃত. আমি ব্যবসা ধরিয়াছিলাম, আর গৃহিণী আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, কাজেই চাসে মন দিয়াছিলেন। এখন বুঝিতেছি, পূর্ণের চেয়ে অর্দ্ধেক ভাল। গৃহিণীর বুদ্ধিতেই কষ্টেসৃষ্টে দু'মুটো জুটিতেছে। যে কলসীর ভারে পরীক্ষাপাথারে ডুবিয়াছিলাম বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আজ সেই কলসীকে আশ্রয় করিয়া সংসারসমুদ্রে ভাসিয়া আছি। স্বাধীন-জীবনবহনের তৃষ্ণাটা মিটিয়া আসিয়াছে—এখন চাকরি জুটিলে করিতে পারি। কিন্তু পাই কোথায় ?

গুরুঠাকুর।

গোস্বামী নিত্যানন্দঠাকুর সবেমাত্র উনপঞ্চাশ-বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার গৃহশূন্য হন। পনের বৎসর পূর্ব্বে আর একবার তিনি পত্নীবিয়োগবিধুর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন ত শোকটা এত লাগে নাই। তখনও গৃহশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহ ত এঁত শূন্যময় হয় নাই। হায়! তবে কি এ শোক মাধ্যাকর্ষণের মত প্রতি-পদে বাড়িয়াই চলিবে? গোস্বামী এখন পূজা করিবার সময় দেখিতে পান, পূজার উপকরণ তেমন সুশৃঙ্খলায় নাই, আহার করিতে করিতে বুঝেন, রন্ধনে তেমন পরিপাট্য নাই, শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, শয্যারচনায় সে নিপুণতা নাই; শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে। এইরূপে দিনে দিনে গোস্বামি-ঠাকুর ইন্দুমতীবিরহে অজের মত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের গুরুগিরি ব্যবসায়, শিষ্যসেবকও বিস্তর, একঘর রাজাও তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত। শীঘ্রই গুরুদেবের এই বিপদের কথা শিষ্যমহলে প্রচার হইল, সেই ভক্ত রাজহৃদয়ে কিছু অধিক মাত্রায় ব্যথা লাগিল। গুরুর এ অঙ্গহীনতা রাজার অসহ্য বোধ হইতেছিল, তাই তিনি ভগ্নার্দ্ধাঙ্গ ঠাকুরের অঙ্গসংস্কারে ব্যস্ত হইলেন। পাত্রীর অনুসন্ধানে দেশবিদেশে লোক ছুটিল। রাজা যে বিবাহের সহায়, সে বিবাহে পাত্রীর অভাব কোথায়? অচিরে একটি রূপগুণসম্পন্না ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা গোস্বামীর কণ্ঠলগ্না হইলেন। লোকে বলিত, ঠাকুরের গলায় এ রত্ন মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পাইবে।

এতদিনে নিত্যানন্দের নিরানন্দ হৃদয় আনন্দে পূরিয়া উঠিল, শূন্যগৃহ আবার পূর্ণ হইল। তখন গোস্বামিঠাকুর নূতন উৎসাহে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে গুরুদেবের প্রবাসযাত্রার সময় আসিল, তিনি প্রবাসে বাহির হইলেন। কিন্তু এবার আর তত দীর্ঘকাল প্রবাসবাস ঘটিল না। বাটীতে প্রবীণ অভিভাবক কেহ নাই, শুধু যুবতী বিধবা ভগ্নী ও বিধবা কন্যা, আর একটি শিশু ভাগিনেয়। বিশেষ ভগ্নী ও কন্যা উভয়েই সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং

অন্যমনস্ক। অন্য সময়ের কথা দূরে থাক্, এ-হেন আনন্দ-ময় বিবাহ-উৎসবেও, গোস্বামী তাহাদের একটিবার হাসি দেখেন নাই। এমন হৃদয়হীনাদের কাছে বালিকা সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়া বেশীদিন দূরদেশে থাকা, ঠাকুর বিধেয় জ্ঞান করিলেন না। কাজেই এবার তাঁহাকে প্রবাসের পালা সঙ্ক্ষেপেই শেষ করিতে হইল। বিশেষ শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না, তাই তিনি তিন-মাসের পরিবর্ত্তে তিন সপ্তাহের মধ্যে গৃহে ফিরিলেন।

গ্রামে অনেকেই সম্বন্ধে গোস্বামীর নাতি। তাহার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদাদা, এবার যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়্‌লেন?" ঠাকুরদাদা আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কি-একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন-সময় নাতি-সম্প্রদায় হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বুঝিস্‌নে ত—চুম্বকের টান কত?" কথাটা বুঝি গোঁসাইজীর মনো-মত হইয়াছিল, তাই তিনি দীর্ঘশিখা দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে ভায়া!"

নিত্যানন্দের সমবয়স্ক-মহলেও তাঁহাকে লইয়া খুব একটা আমোদ পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন, "কি হে নিত্য ভায়া, দিন্‌কের দিন যে শ্রী ফিরে যাচ্ছে, পাকা

হরীতকী খেলে নাকি ?" সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ভায়াকে আর কিছু খেতে হবে কেন ? জান না —বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।"

দিলীপ যেমন তিনসপ্তাহ ধরিয়া কামধেনু-নন্দিনীর আরাধনায় পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, আমাদের গুরুঠাকুর তেম্নি তিনটি বৎসর শ্বশ্রূনন্দিনীর পরিচর্য্যায় দৈবপ্রসাদাৎ একটি পুত্র পাইলেন। গৃহে আর আনন্দ ধরে না! দেখিতে দেখিতে ছেলেটি নির্ব্বিঘ্নে আট মাস অতিক্রম করিল; মহাধুমধামে অন্নপ্রাশন সমাধা হইয়া গেল। কেবল নামকরণ লইয়া একটু গোল বাধিয়াছিল। গোস্বামিঠাকুরের ইচ্ছা, ছেলেটির নাম হয় সচ্চিদানন্দ, কিন্তু নাম শুনিয়াই গোঁসাই-গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন, নামটার সঙ্গে সঙ্গে যেন শিখা-কণ্ঠী-তিলকধারী এক বিভীষিকা-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "আমার সোণার বাছার এমন বুড়োটে নাম হতে গেল কেন ?" তখন তিনি বাছিয়া বাছিয়া নাম রাখিলেন—হেমচন্দ্র। বুঝি গোঁসাই-গৃহিণীর মৃণালিনীখানা পড়া ছিল। যাই হোক্, শেষ হেমচন্দ্র নামই বলবৎ রহিল। গোস্বামিমহাশয় যদি কখনও ভ্রমক্রমে আদর করিয়া ছেলেকে সচ্চিদানন্দ

বলিয়া ফেলিতেন, তবে তখনই মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া, আশপাশ চাহিয়া, মনে মনে বার-কত বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্র পঞ্চ বর্ষ অতিক্রম করিল। এখন তার লেখাপড়ার পালা। সে অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বার-বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে ছয়খানা বাংলা বই শেষ করিয়া ফেলিল। তখন গোস্বামী ঠিক করিলেন, ছেলেকে "মুগ্ধবোধ" পড়িতে দিবেন ; ভরসা, সে ভবিষ্যতে সাহিত্য ও স্মৃতি চর্চ্চা করিয়া একটা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিবে। কিন্তু হেমের গর্ভধারিণী তায় রাজি নন। তিনি চান, ছেলেকে ইংরাজীও শিখাইতে হইবে। শেষ নিত্যানন্দের সেই প্রিয়শিষ্য রাজা বাহাদুরের সাহায্যে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে হেমচন্দ্রের পড়া ঠিক হইল। রাজার দুই পুত্র কলিকাতায় পড়িতেন, গুরুপুত্রও এখন হইতে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমারদ্বয় গুরুপুত্রকে লইয়া প্রথম-প্রথম কিছু সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। বৎসর-কত কলিকাতায় থাকিয়া কুমার-যুগলের পান-আহারটা পিতার অগোচরে কিঞ্চিৎ ম্লেচ্ছ-সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। পাছে এ সকল ব্যাপার গুরু-

পুত্রের নয়নগোচর হইয়া, গুরুসূত্রে পিতার শ্রুতিগোচর হয়, এ ভাবনা তাঁহাদের মনে প্রায়ই হইত, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা বুঝিলেন, সে ভয় নিতান্তই অমূলক। অচিরাৎ এমন দিন আসিল, যখন গুরুপুত্র বলিতেন, "এ সব ছাড়্‌তে হয়, তোমরা ছাড়,আমি কিন্তু আর ছাড়্‌চি না।"

এইরূপে হেমচন্দ্র একাদিক্রমে পাঁচবৎসর কলিকাতায় কাটাইল। সে এই কয় বৎসরে সংস্কৃত কলেজে দুইবার "প্রোমোশন" পাইয়াছে। এখন আর সে ইংরাজী বুক্‌নি ভিন্ন কথা বলিতে পারে না। হেম যখন বাড়ীতে আহার করিতে বসিয়া বলে, তরকারিগুলা অতি nasty, বাটিটা বড় dirty, তখন তার মা ও পিসি অবাক্ হইয়া মহানন্দে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হেমের বিদ্যা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না। এই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গুরুগিরি ধরিতে হইল। তবে ব্যবসাটা তার মনোমত নয়। টেরি মুছিয়া টিকি রাখিতে, সার্ট ছাড়িয়া নামাবলী ধরিতে, সত্যই তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু কি করে, এমন সুবিধা ত আর কিছুতে হয় না, কাজেই সে ব্যবসাটাকে ত্যাগ করিতেও পারিল না।

তবু সে উহার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম কাটিল, ঠিক করিল টেরিটা ত থাকিবেই, সঙ্গে সঙ্গে টিকিও রাখিবে, কিন্তু "হোমিওপ্যাথিক্ ডোজে" ; তিলকও কাটিতে হইবে—তবে সেটা রসকলির রূপান্তরমাত্র। আবার দায়ের উপর দায়, শিষ্যবাড়ীতে মালা না পরিয়া গেলেও চলে না। অগত্যা সে এক হুক-লাগান মালা সংগ্রহ করিল। মালাটা পকেটেই থাকিত, আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ পকেটের মালা গলায় উঠিত। কিন্তু ইহাতেও ত নিষ্কৃতি নাই, দুষ্ট লোকে আবার তাঁর সাধের গোঁফ-দাড়ির উপরেও কুদৃষ্টি দেয়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে ইহারও একটা কিনারা করিয়া ফেলিল। যদি কেহ বলিত, "গোঁসাই-ঠাকুরের গোঁফ-দাড়ি কেন ?" তবে সে তখনই হাস্যমুখে উৰ্দ্ধদৃষ্টে হাত-দুটি জোড় করিয়া, সে যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করাইয়া একটা ভাব ধারণ করিত, অর্থ—এ সব বাবা তারকনাথের মানত। হেমচন্দ্র আর এক সমস্যায় পড়িল। সে দেখিল, গায়ত্রী না জপিলে, জপ-আহ্নিক না করিলে, এ ব্যবসায়ে মান থাকে না। কলিকাতায় থাকিতে, প্রথম-প্রথম যাবনিক খাদ্যগুলা শোধন করিবার নিমিত্ত গায়ত্রী জপার প্রয়োজন হইত বটে, কিন্তু সে যে অনেক কালের কথা!

এখন ত তার কিছুই মনে নাই! তবু সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল। শিষ্যবাড়ী গিয়া সে স্নানান্তে সুর করিয়া আওড়াইত!—

"অত্রার্চ্চায়াং স্বতী নাতিক্রমেঽতিঃ পর্যাধী গতৌ।
অপিঃ পদার্থসংভাব্যগর্হানুজ্ঞাসমুচ্চয়ে।
মুরারিঃ, লক্ষ্মীশঃ. বিষ্ণুৎসবঃ, হৃষীকেশঃ, দামোদরঃ।
মাধবর্দ্ধিঃ, শিবঙ্কার, কৃষ্ণৈকত্বং, মুকুন্দোকঃ, কৃষ্ণৈকাং, ভবৌষধম্।"

সাধারণ শিষ্যবর্গ ভাবিত, ঠাকুরপুত্র ঠাকুর অপেক্ষাও পণ্ডিত। কই ঠাকুর ত এমন করিয়া আহ্নিক করিতে পারিতেন না।

হেমচন্দ্র স্থানবিশেষে গীতামহিমা ও বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যা ও শিষ্য বর্গের প্রেমভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেন। সুবিধা পাইলেই বিবর্ত্তবিলাসের অর্থ এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মও যথাস্থানে প্রচার করিতেন। একদিন মেদিনীপুর-অঞ্চলে কোন শিষ্যের অন্তঃপুরে তিনি রাসলীলা লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন, এই উপলক্ষে সে বাড়ীর জনৈক ইংরাজি-পড়া নব্য যুবা নিতান্ত অহিন্দুর মত ব্যবহার করিয়াছিল। সে কিনা ঠাকুরপুত্রকে বাহিরের এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া

বলিয়াছিল, "ঠাকুর, কাল রাসলীলার অভিনয় দেখিয়েছেন, আজ গোবর্দ্ধন-ধারণ কর্‌তে হবে।" সেই ভক্তিহীন পাষণ্ডের পীড়নে ঠাকুরপুত্র নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষ প্রবীণ ভক্তের দল জুটিয়া ঠাকুরপুত্রকে এই দানবের হাত হইতে উদ্ধার করেন। শুনিতে পাই, সেই হইতে হেমচন্দ্র শিষ্যগৃহে শাস্ত্রব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়াছে।

উকীলের কাহিনী।

শৈশবে স্কুলে যাইবার সময় দেখিতাম, উকীলবাবু শাম্‌লা মাথায়, চেন্ আঁটিয়া, গাড়ি চড়িয়া আদালত চলিয়াছেন। মনে মনে প্রার্থনা করিতাম, "ঠাকুর, আমিও যেন উকীল হই!"

সে প্রার্থনা যেদিন পূর্ণ হইল, তাহার অব্যবহিত পরেই একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম। সে অঞ্চলে এখনও উকীল বড়-একটা জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত সেখানে,—বিশেষ মেয়ে-মহলে, আমি একটা অভূতপূর্ব্ব জীব হইয়া পড়িলাম। মেয়ের দল ঝাঁকে ঝাঁকে জামাই দেখিতে আসিলেন, একজন মুরুব্বি-পক্ষ শাশুড়ি-ঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাঁচটা-পাস্-করা জজের-উকীল জামাই পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা, সার্থক শিবপূজো তোমার মেয়ের!" সেই

প্রবীণার যুবতী কন্যাও তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, মার এই কথায় কন্যারত্নের একটু ভাবান্তর দেখিলাম; তাঁর মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি ভাবিতেছেন,——

"কেন না হইলে তুমি জজের উকীল
হে প্রাণবল্লভ!"

দ্রৌপদী শিবের বরে পঞ্চ-পাণ্ডব স্বামী লাভ করিয়াছিলেন; বোধ হয় শিবপূজার জোরেই আমার স্ত্রীর কপালে এমন "পঞ্চপাস্‌ওয়ালা" স্বামী জুটিয়াছিল! জামাতার পদগর্ব্বে শাশুড়ি-ঠাকুরাণীকেও যখন এতাধিক গর্ব্বিতা করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সেজন্য শাশুড়িনন্দিনী স্বয়ং যে কিঞ্চিৎ গর্ব্বরসাপ্লুতা হইবেন না, ইহা সম্ভব নহে। বালিকা নিশ্চয়ই একটু দেমাকে পা ফেলিয়াছিল, তার মলের আওয়াজটাও যেন 'রুণিঝুনি' না বলিয়া 'ঝম্‌ঝমে' বাজিয়াছিল; এইরূপে আমার যশোদুন্দুভি প্রথমেই আমার গৃহিণীর চরণযুগল আশ্রয় করিয়া ঘোষিত হইল।

আশায় উৎসাহে আমি আবার কলিকাতায় ফিরিলাম। এখন আমার প্র্যাক্‌টিসের পালা। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বি-এ পাস্‌ করার পরই আমি হাইকোর্টের উকীল * * * বাবুর আর্টিকেল-ক্লার্ক হইয়াছিলাম। কাজেই

"জজের উকীল" না হইয়াই আমি একবারে হাই-কোর্টের উকীল হইলাম। নূতন শাম্‌লা আঁটিয়া, চেন্ ঝুলাইয়া, আমি রীতিমত কোর্টে যাইতে লাগিলাম। মনে মনে জ্ঞান, এখন আর আমি বড় যে-সে নই! জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এবং আমি, এক শ্রেণীরই লোক! তবে তাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়াছেন, এই যা! কিন্তু চাই-কি দুদিন পরে, সে প্রভেদটুকুও না থাকিতে পারে।

শুনিয়াছিলাম, হাইকোর্টের কোন কোন প্রধান উকীল মক্কেলের সহিত তেমন সদ্ব্যবহার করেন না, একটির স্থলে দুটি প্রশ্ন করিলে নথিপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু মক্কেলেরা তবু তাঁহাদের নিকটে যাইতে ছাড়ে না! প্রথমে ভাবিলাম, তবে বুঝি মক্কেলের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেই ভাল উকীল বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যায়! পসার-বৃদ্ধির সোপান ভাবিয়া আমি প্রথমত এই নজির অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। একদিন কোন মক্কেল আমার এরূপ ব্যবহারে একটু হাসিয়া, একটি ব্যাঙ্ হস্তীর অনুকরণ করিতে গিয়া কিরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, তাহারই গল্প করিল। এই চতুষ্পদ প্রাণীর গল্প শুনিয়া একবার মনে

হইয়াছিল, এটা বুঝি শ্লেষ! কিন্তু শেষে বুঝিলাম, ইহাতে বরং আমার পদবৃদ্ধিই হইল! যাই হোক্, এইরূপ নজিরে আর বেশীদিন চলিলাম না, একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধরিলাম। মক্কেল আসিলেই মহা-সমাদর করিয়া অতি যত্নে কাগজ-পত্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহাতেও বড় সুফল ফলিল না। আমায় কাগজপত্র দেখাইয়া গিয়া মোকদ্দমার সময় তারা অন্য উকীল নিযুক্ত করিতে লাগিল! প্রথম-প্রথম ব্যাপার বুঝিতে পারিতাম না, শেষ শুনিলাম, আমার কাছ হইতে বাহিরে গিয়াই তারা বলাবলি করিত, "উকীলটা নিশ্চয়ই নিতান্ত রোতো, ভাল উকীল হ'লে কি আর এমন খাতির-যত্ন করে!" এইরূপ বিশ্বাসেই তারা আর আমাকে মোকদ্দমা দিতে সাহস করিত না। আমি কিন্তু এদিকে মহা-মুস্কিলেই পড়িলাম, তবে আর মক্কেলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব? এখন আমার অবস্থাটা দাঁড়াইল;—

"সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ।
উপরে রাজার ভয়, পাতালে ভুজঙ্গ॥"

এইরূপে দিনে দিনে আমার দশা বাস্তবিকই বড় শোচ-নীয় হইতে লাগিল। ছ'মাস-ছ'মাস যায়, কিন্তু মক্কেলের

আর নাম-গন্ধ নাই! কোর্টে গিয়া বার্‌লাইব্রেরির বারাণ্ডায় ঘনঘন পদচারণা করিতাম, আশা, যদি কোন মক্কেল জুটে! যেখানে পাঁচটা লোকের ভিড়, তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া উঁকি মারিতাম, ভরসা, ইহার মধ্যে যদি কেহ সস্তা উকীলের খদ্দের থাকে! শিকারী যেমন শিকারের অনুসন্ধানে দিগ্বিদিক্-জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, আমিও তেমনি মক্কেলের সন্ধানে অধীর হইয়া বেড়াইতাম। শেষ ক্লান্ত হইয়া আবার লাইব্রেরিতে গিয়া বসিতাম। এইরূপে বাসক-সজ্জায় বেলা এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কোর্টে কাটাইতাম, কিন্তু মক্কেল জুটিত না! তখন মনে হইত,—

"কাঁদি আমি তারু তরে,
তবু সে চাহে না ফিরে,
মক্কেল নিষ্ঠুর।"

এইরূপে আমার দিন কাটিতে লাগিল—পতিবিরহে যুবতীর দিন যেমন বৃথায় কাটে, তেমনি কাটিতে লাগিল। শনিবার-রবিবার আসিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম, কেন না, সে দু'দিনে ট্রামভাড়ার চারি-আনা বাঁচিয়া যাইত। এখন সেইটাই আমার উপার্জ্জন! তোমরা কাহাকেও বলিও না, আমি গোপনে গোপনে রাত্রে একটি "টিউশনি"

করিতাম। নহিলে "মেসে"র খরচ চলে না। পূজার পূর্ব্বে কোর্ট বন্ধ হইলে, উকীলগণ, কেহ বোম্বাই, কেহ দার্জ্জিলিংএ বেড়াইতে গেলেন। আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছুটিতে কোথায় যাবেন?" আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "পশ্চিমে।" বাস্তবিকই আমি পশ্চিম রওনা হইলাম। হাবড়ায় ট্রেণে চাপিয়া বর্দ্ধমানে নামিলাম। পশ্চিম বটে! আমি কিন্তু সেখানে বেড়াইতে যাই নাই, আমার উদ্দেশ্য অন্য। হাইকোর্টের ভাব ত দেখিলাম, এখন যদি জেলা-কোর্টে কিছু হয়, তাই আমার বর্দ্ধমানে আগমন! বর্দ্ধমানে আগমন শুনিয়া পাঠকবর্গ যেন আর কিছু না মনে করেন। কেন না, আমি বিদ্যালাভ কলিকাতাতেই করিয়াছি, এখানে আসা কেবল অর্থলাভের জন্য।

কিন্তু এখানেও যে আমার মত ডজন-দেড়েক বেকার উকাল! তবে বর্দ্ধমানের প্রধান উকীলবাবুটি আমাদের দেশীয় এবং স্বজাতি। বিশেষ আমি তাঁর এক আত্মীয়ের নিকট হইতে একখানি সুপারিস-পত্রও লইয়া গিয়াছিলাম, এই যা ভরসা! উকীলবাবুটি কিছু সাহসও দিলেন; আমি সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, পূজার ছুটির

পর হইতে বর্দ্ধমানেই "প্র্যাক্‌টিস্" আরম্ভ করিলাম। সেই মুরুব্বি উকীলবাবুটির বাসায় দুটি বেলায় হাজিরা দিতাম, তাঁর ছেলেদের পড়াশুনার খবরও লইতাম, মাঝে মাঝে তাহাদের সে বিষয়ে সাহায্যও করিতাম, আর তাঁর ছোট ছেলেটিকে লইয়া আদর করিতেও ত্রুটি করিতাম না! হায় হায়! আমিই না একদিন আমাতে ও হাইকোর্টের জজে বড়-একটা প্রভেদ নাই ভাবিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছিলাম! সেই আমি আজ কিনা একজন জজ-কোর্টের উকীলের চাটুকার! তাঁর একটি কৃপা-কটাক্ষের আশায় আজ আমি লালায়িত! একেই বলে,—

"পুরুষের দশ দশা
কথনও মশা কথনও হাতি।
যথন যেমন, তথন তেমন
(এখন) পেটের দায়ে চিঁড়ে কুটি।"

সে যা হোক্, এখন উকীলবাবুটির কৃপায় কিছু কিছু পাইতে লাগিলাম। তাঁর দুই-পাঁচটি মক্কেলদের বলিয়া-কহিয়া আমার নামটাও তিনি 'ওকালতনামায়' লেখাইয়া দিতেন। আমিও এ সুবিধা ছাড়িবার পাত্র নহি। এই সুযোগে কিসে পসার করিয়া লইব, বিধিমতে সে চেষ্টা

পাইতাম। কোনদিন যথন উকীলবাবু জজের সম্মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত, তথন আমি একবার তাঁর পাশে দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে কাণে কাণে বলিতাম, "একটু জল থাবেন কি ?" উকীলবাবু ব্যাপার বুঝিয়া একটু হাসিতেন, মক্কেলরাও ভাবিত, না জানি কি পরামর্শই বা আমি দিলাম ! এইরূপে নানা ফন্দীতে মক্কেলের মনোযোগ-আকর্ষণের চেষ্টা করিতাম, চেষ্টাটা নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। তিন-চারি-মাসের মধ্যেই আমার টাকা-পঁচিশ বাঁধা আয় দাঁড়াইল, ক্রমে আরও কিছু বাড়িল। কিন্তু তাহাতেও টানাটানিটা ঘুচিল না, কেন না, এথানে ভিন্ন বাসা করিতে হইয়াছিল। নহিলে মান থাকে না। আবার বাড়ীতেও কিছু কিছু পাঠাইবার দরকার। যাই হোক্, ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে, এ বিশ্বাস জন্মিল। মনে করিলাম, টাকা-পঞ্চাশ আয় হইলেই পরিবার কাছে আনিব, কিন্তু সে আয় আর হইল না, সে আশা আর পূরিল না ! কপালগুণে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িল; আমার সেই উকীলবাবুর জামাতা 'ল'-পাস্ করিয়া এথানে প্র্যাকৃটিস্ করিতে আসিলেন। উকীলবাবু আর আমার উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, পূর্ব্বের

মক্কেল যা দু-পাঁচটা পাইয়াছিলাম,তা-ও একে একে কমিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম, শুধু উকীল হইলেই চলে না, উকীল শ্বশুর থাকাও চাই। ছেলেবেলায় এটা জানিতাম না, জানিলে ঠাকুর-দেবতাদের কাছে সে প্রার্থনাটাও করিয়া রাখিতাম।

আর একটা কথা, আমার স্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করিত, "উকীল হলে, কিন্তু টাকা কই ?" তখন তাকে বুঝাইতাম, "পাণ্ডবের মত এখন এটা আমাদেরও অজ্ঞাতবাস। অতএব ধৈর্য্য ধর, কিছুদিন কষ্টের পর শীঘ্রই রাজত্ব মিলিবে।" কিন্তু মাস গেল, বর্ষ গেল, রাজত্ব ত মিলিল না; তবে এখন আর তাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? তাঁর সইয়ের কেরাণী-স্বামী, সে-ও ত দু'দশ টাকা আনে, আর আমি পিতলের কাটারী, তার কোন কাজেই আসিলাম না! তোমরা কেহ বলিতে পার, কতদিনে আমার এই অজ্ঞাতবাস ঘুচিবে ?

ডেপুটি-তত্ত্ব।

যে দিন দুস্তর পরীক্ষা-সাগর লঙ্ঘন করিয়া ডেপুটিত্ব প্রাপ্ত হই, সে দিন বড় আনন্দের দিন! সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজিও সে দিনের সে মধুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া আছে।

এ সংবাদ যখন শুনিলাম, তখন আমি কলিকাতায়। পরোয়ানা পাইয়াই, একবার বাড়ী আসিলাম। ইচ্ছা, এখান হইতে কর্ম্মস্থানে যাইব। ইতিপূর্ব্বে আমাদের এ অঞ্চলে আর কেহ ডেপুটি হন নাই, কাজেই আমি হাকিম হইয়াছি সংবাদে আমাদের সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল! নিধু মণ্ডল, সিধু সেক বলাবলি করিতে লাগিল, সেই সেদিনকার 'দা ঠাকুর' আমি, আমি কিনা আজ 'ডিগ্‌রি-ডিস্‌মিসের করতা'! আর কি রক্ষা আছে! তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাকে পাকে আশে-

পাশের লোকে আমার নিকট আসিয়া, কেহ বা দুটা কথা কহিয়া, কৃতার্থ হইতে লাগিল! 'পোড়ো' পড়া রাখিয়া, চাষা লাঙল ছাড়িয়া, রাখাল গরু ফেলিয়া আমার দিকে ছুটিল! বালিকা খেলা ভুলিয়া, জননী শিশু কাঁদাইয়া, গৃহিণী গৃহকাজ ছাড়িয়া, বধূ ঘোমটা আড়াল দিয়া আমায় দেখিতে লাগিল। আমি যেন সেই ব্রজবিহারী বংশীধারী বনমালী, আর এই গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ডেপুটি-রবে-মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনা! অন্তঃপুরেও দেখি, সে রবে গৃহিণীও আমার বিহ্বলা! তাঁর সেই গর্ব্ববিস্ফারিত নয়নযুগল যেন সদাই বলিতেছে,

"এতেক যুবতী আছে গোকুলনগরে
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে!"

এইরূপে আমার ব্রজের লীলা-খেলা ফুরাইল, তখন মথুরায় চলিলাম! গিয়াই আমার অদৃষ্টে ডেপুটির সিংহাসন জুটে নাই। গবর্ণমেণ্ট কয় মাস ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের 'আড়গড়ায়' ব্রেক্ করিয়া লইয়া তবে আমাকে অন্য জেলার ডেপুটিগিরিতে জুড়িয়া দিলেন। এ সময়ের লাঞ্ছনায় প্রথম-প্রথম বড় কষ্ট হইত, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলাম, এ-কয়টা-মাস ডেপুটিত্ব-রূপ স্বর্গে উঠিবার সোপান! কষ্ট

করিয়া এ সিঁড়ি না ভাঙিলে কেমন করিয়া সে স্বর্গসুখ লাভ করিব?

তার পর ডেপুটিগিরির পালা!

ম্যাজিষ্ট্রেট যে কি 'চিজ্', তা এই কয় মাসে আমি অনেকটা সম্‌জাইয়াছিলাম, সুতরাং নূতন কর্ম্মস্থানে পোঁছিয়াই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু সাহেব বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সেদিন আর তাঁর সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিল না। আদেশ হইল, কাল প্রাতে দেখা মিলিবে। আমার বাসা হইতে সাহেবের কুঠি প্রায় চার-মাইল, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, আমি পরদিন ঠিক সময়ে হ্যাট্-কোটে চারু অঙ্গ শোভিত করিয়া অশ্বারোহণে, "নদী যথা ধায় সিন্ধুপানে" সাহেবের কুঠি-অভিমুখে ছুটিলাম। আমি একজন ডেপুটি; কিন্তু সাহেবের চাপরাশি, আমায় বসিতে বলা দূরে থাক্, একটা সেলামও করিল না! দু-একটা কথায় বুঝিলাম, চাপরাশি-সাহেবের মেজাজটাও গরম,—ঠিক যেন মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত বালুকা-রেণু! ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশিরাও যে এক-একটি ক্ষুদ্র লাট, সে অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু আমি যখন মহাদেবের সন্দর্শন-কামনায় আসিয়াছি, তখন নন্দীর মন-

তুষ্টি না করিলে চলিবে কেন? সাহেবের নিকট কার্ড পাঠাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরেই গম্ভীর মূর্ত্তিকে গম্ভীরতর করিয়া চাপরাশি আসিয়া জানাইল, মেম-সাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন, এখন আর সাহেবের দেখা মিলিবে না; আফিসের বেলা হইতেছিল, কাজেই শীঘ্র ফিরিতে হইল। ফিরিতে ফিরিতে বিষণ্ণ মনকে বুঝাইতে লাগিলাম,—

"ডেপুটি হইতে গেলে সুখ-দুখ সইতে হয়
এ কাজের এই রীতি, তোমা বলে শুধু নয়।"

ফিরিবার সময় কিছু ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলাম। তখন আর সে তেজ নাই। অশ্বরাজও যেন সেটি বুঝিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পোষাকটা আমার পূরা সাহেবি ঢংয়ের ছিল, হ্যাট্-কোট্-কলার্-বুট্ কিছুরই অভাব ছিল না, সাহেবির যা একটু খুঁৎ,তা কেবল বর্ণে। রংটা আমার কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ ঘোর। আমি একটা মাঠের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, জনৈক রাখাল "ওরে সাহেব দেখ্‌বি আয় রে" বলিয়া সঙ্গীদের ডাকিতে ডাকিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু একটু তফাৎ হইতেই আমার সেই কৃষ্ণমূর্ত্তিখানি দেখিয়া, "না রে না, সাহেব নয়, সাহেব নয়, সাহেবের সুমুন্দি" বলিতে বলিতে

ছুটিয়া ফিরিয়া গেল। রাগের কথা বটে, কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থায় রাগ হয় নাই, বরং লজ্জা হইয়াছিল। তোমরা শুনিয়া হয় ত হাসিবে, আমি কিন্তু সেইদিন হইতেই সাহেবি-পোষাক, সাহেবি-ঢং ত্যাগ করিয়াছি।

তার পর ডেপুটির আসনে বসিয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট, সবাই ছিলেন, কিন্তু আমার খাটুনির ইয়ত্তা ছিল না। বেলা এগারটা হইতে রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত সমানভাবে খাটিয়াও কাজের কূল পাইতাম না। আব্গারি, ট্রেজারি, বিচার, সকল দিক্ই আমায় দেখিতে হইত, তাহাতেও সাহেবের মন পাইতাম না। কালেজ ছাড়িয়াই কাজে প্রবৃত্ত হই, কাজেই দয়া এবং বিবেকশক্তি তখনও সতেজ অবস্থায় ছিল, সাধ্যপক্ষে কাহাকেও অধিক সাজা দিতাম না। এজন্য উপর হইতে বেশ একটু তিরস্কৃত হইলাম। বিচারপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। ক্রমে আমার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল—অন্য আসামী দূরে থাক্, পাঁচ আইনের আসামীও অল্পে রক্ষা পাইত না। একবার আসামী হইয়া অভিযুক্ত হইলে, আমার হাতে তার আর

নিষ্কৃতি ছিল না। শীঘ্রই খুব কড়া হাকিম বলিয়া আমার নাম ছুটিল। উপরওয়ালারও যেন একটু সুদৃষ্টি পড়িল। কিন্তু হরিবোল হরি! আপীলে যে রায় বড়-একটা বাহাল থাকে না! কেবল যে রায় উল্টাইয়া যায়, তা-ই নয়, সেই রায়ের উপর জজ-সাহেবের মন্তব্য দেখিয়াই চক্ষু স্থির! তখন আমি 'উভয় সঙ্কটে' পড়িলাম—

"একদিকে জাতি-কুল আর দিকে কালা,
শ্যাম দেখি কি কুল রাখি কি বিষম জ্বালা!"

ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষ কুলই ছাড়িলাম; গঞ্জনার ভয় করিলাম না! এদিকে আবার কূল পাওয়া চাই ত!

আর একটা মহাসুখ এই 'ভূতোনন্দী' খাটুনির উপর বুড়ো বয়সে পরীক্ষার তাড়া — এত অগ্নিপরীক্ষাতেও নিস্তার নাই—আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি জন্মদুঃখিনী সীতারও যাহা অসহ্য হইয়াছিল, পেটের দায়ে আমাদের তা-ও সইতে হয়!

এইখানে বলিয়া রাখি, কেবল আমিই যে প্রত্যহ কাছারিতে বিচার করিতাম, তা নয়; আমার গৃহেও প্রত্যহ মেয়েদের একটি এজলাস বসিত। উকীল-মোক্তারেরও অভাব ছিল না। সেখানে উপস্থিত-অনুপস্থিত অনেক

আসামীর বিচারকার্য্য অবাধে চলিত। বিচারকর্ত্রী—ওয়ারিশ ও অর্দ্ধাঙ্গিনী সূত্রে স্বয়ং আমার গৃহিণী! তিনি অটল ও নির্ব্বিকার চিত্তে রায় প্রকাশ করিতেন, কেন না তাঁর—

"উপরে আপীল নাই, নাইক জজের ভয়।"

বুঝি ডেপুটি হওয়ার চেয়ে ডেপুটি-গৃহিণী হওয়া অনেক সুখের!

বছর-কয়েকের মধ্যেই আমাকে অনেকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্টের অধীনে কাজ করিতে হইল। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের মেজাজ বুঝিতে না বুঝিতে আর একজন উপস্থিত! এ যে কি জ্বালা, তাহা বুঝান বড় শক্ত! 'হিন্দু-রমণী' স্বামীর একান্ত দাসী বলিয়া তাঁহাদের দুঃখে অনেকে দুঃখিত; কিন্তু আমি ত দেখি, ডেপুটির চেয়ে তাঁরা ঢের সুখী। পরাধীনা হইলেও তাঁরা একটিমাত্র স্বামীর অধীন। ইচ্ছা করিলে সে স্বামীর মেজাজ বুঝিয়া চলা বড় কঠিন নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল বটে, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে যৌবনে পঞ্চপতি লাভ করিয়াছিলেন, কাজেই পাঁচজনের মন জোগান তাঁরও তত কঠিন হয় নাই। কিন্তু আমাদের যে—

"নব রে নব নিতুই নব।"

চিরকাল নূতনের মন কি দিয়া জোগাই বল! এ যে—

"ভাঙা বাগান জোগান দেওয়া ভার!"

দেশহিতৈষিগণ হিন্দুললনার দুর্দ্দশা ঘুচাইতে বদ্ধপরিকর! কবি, তাঁহাদের দুঃখে, কবিতা লিখিতে তৎপর! কিন্তু কই, এই অধম ডেপুটির দুঃখে ত কেহ কাতর নয়! কই আমাদের কপালে কেশব কি বিদ্যাসাগর, "এ দুখ নাশিতে" এ পর্য্যন্ত কেহই ত অগ্রসর হলেন না! কি করি, এখন মনের কষ্টে নিজেই বলি,—

"দারুণ বিধাতা কেন রে আমারে
ভারতে পাঠালে ডেপুটি ক'রে রে।

... ...

কোথায় কংগ্রেস, সুরেন কি কর,
হ'য়ে অগ্রসর এ দুখ নাশ রে।"

এত দুঃখ সত্ত্বেও ডেপুটিত্বে একটু সুখ ছিল, মনে মনে ভাবিতাম, হাকিম ত বটি! দশজনের নিকট একটু "পেগের বড়াই"ও ছিল। কিন্তু ছোটলাট ইলিয়াট-বাহাদুর আমাদের সে ভুর ভাঙিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ডেপুটি আবার হাকিম, তেলা-পোকা আবার পাখী! এত-

দিন যে সুখের স্বপ্ন দেখিতাম, এখন তা-ও ভাঙিয়াছে। এখন শুধু ভাবি,—

"ডেপুটি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভারতে আনিল কে ?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে'!

ডেপুটি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়!!

কে বা নিরমিল ডেপুটিসাগর
নিরমল তার জল!
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল!!

ম্যাজিষ্ট্রেট-জ্বালা জলের শিহালা
জয়েণ্ট জিয়ল মাছে,
লাট পাণিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে!!

জজের পানায় সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি,
অন্তর-বাহিরে কুটুকুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি!
কহে প্রেমদাস 'শুনহে ডেপুটি,
সুখ-দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে হয় ডেপুটি,
দুখ যায় তার ঠাঁই।'"

এডিটার।

নদেরচাঁদ পাঁচ বৎসরে পদবিক্ষেপ করিলে, শুভদিনে শুভক্ষণে হাতে খড়ি পড়িল। ভক্ত প্রহ্লাদের মত নদের-চাঁদ 'ক' দেখিয়াই কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু কৃষ্ণনাম মনে হইয়াছিল কি না, ইতিহাসে তা লেখে না। তবে লোকে বলে, পরিণত বয়সে সে যে কাগজ বাহির করিয়াছিল, তাহারই আদি অক্ষর 'ক'য়ে ঐরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। "বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ" নাকি বলেন, তাড়িতশক্তিপ্রভাবে পরিণামদর্শনজনিত স্নায়বীয় স্ফুরণে এইরূপ রোদন সম্ভব।

বছর-কয়েক বাংলা পড়িতে পড়িতে দেখা গেল, নদের-চাঁদ রচনায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী। পণ্ডিতমহাশয় একদিন "বিদ্যালয়-বর্ণন" লিখিতে দিলে, নদেরচাঁদ সেই রচনার এক স্থানে লিখিয়াছিল, "নারায়ণের হস্তে যেমন সুদর্শন, ব্রহ্মার হস্তে যেমন কমণ্ডলু, মহাদেবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের

হস্তে যেমন বজ্র, ভীমের হস্তে যেমন গদা, বানরের হস্তে যেমন খোন্তা, পণ্ডিতমহাশয়ের হস্তে তেমনই বেত।" এই প্রবন্ধপাঠের পর পণ্ডিতমহাশয় নদেরচাঁদের Theoretical বেত-বর্ণন তাহার পৃষ্ঠে কিছু অধিকমাত্রায় Practicalএ পরিণত করিলে, নদেরচাঁদ বাংলা স্কুল ত্যাগ করিয়াছিল।

বয়সের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেও, নদেরচাঁদ ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইল। "খুদে পিঁপ্ড়ের" দলে "ডেয়ো পিঁপ্ড়ের" মত নদেরচাঁদ ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে A. B. C. আরম্ভ করিল। A. B. C. পড়িতে পড়িতে মাষ্টার-মহাশয়ের দিকে বই আড়াল দিয়া সে নানারূপ মুখভঙ্গি করিত এবং A. B. C.র সহিত মিল করিয়া অনেকপ্রকার ছড়া আওড়াইত। শুনিয়া নিরীহ ছেলের দল হাসিয়া বাঁচিত না। নদেরচাঁদ যে রসিকতায় পরিণত বয়সে সুপরিচিত হইয়াছিল, এই হইতেই তাহার সূত্রপাত। ফাষ্ট বুক্ আরম্ভ করিয়াই P. u. t. put পুট্, আর B. u. t. but বাট্, এরূপ অযথা বিভিন্নতা কেন হয়, বলিয়া মাষ্টারের সহিত সে মহাতর্ক বাধাইয়াছিল। সেই অদ্ভুত তর্কে তাহার ন্যায়শাস্ত্রোপযোগী বুদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, সেই অঙ্কুরের ফলে, না পড়িয়াও

নদেরচাঁদ সম্পাদক-অবস্থায় সর্ব্বদেশীয় ন্যায়শাস্ত্রের উপর comment করিতে পারিত।

পাঁচ-সাত-বৎসরের মধ্যেই নদেরচাঁদের প্রতিভা-কিরণ স্কুল বিভাসিত করিয়া ফেলিল। সে যখন থার্ড ক্লাসে পড়িত, তখন গৃহপালিত-গাভি-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখে, তাহা মাষ্টার-মহাশয় ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখে আমরা নদেরচাঁদের সেই রচনার যে দুই-তিন-ছত্র শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—"We have a cow, she is a four-sided animal, she gave us milk." Gives না লিখিয়া Gave কেন লিখিল, জিজ্ঞাসা করায় নদেরচাঁদ তাড়াতাড়ি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিল, "আজ্ঞে, আগে দুধ দিত, সম্প্রতি গাবীন।" নদেরচাঁদ এইরূপ বিদ্যা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে ফাষ্ট ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, শেষ টেষ্ট পরীক্ষার পর তাহার পিতাকে বুঝাইল, লেখাপড়া যাহা শিখিবার, তা সে শিখিয়াছে, এখন পরীক্ষা দেওয়া অনর্থক; পরীক্ষায় প্রতিভার অপব্যয় হয় মাত্র। সে আরও দেখাইল, রামগোপাল, কেশবচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বড় বড় লোক কেহই ক্ষপরীা দেন নাই। পিতা বুঝিলেন, পুত্রের

কথা প্রকৃত বটে, বিশেষ দুই-তিন-বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নদেরচাঁদ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছে। সেই তরুণ অবস্থাতেই অনুপ্রাসসঙ্কুল মধুর ভাষায়, আর চটকপূর্ণ সুন্দর বর্ণনায় লেখক বলিয়া পুত্রের যে বেশ নামডাক হইয়াছিল, তাহাও নদেরচাঁদের পিতা শুনিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, পুত্র মিথ্যা বলিতেছে না। অল্প দিনের মধ্যেই নদেরচাঁদ হাফ্ শেয়ারে এক "সব্ এডিটারি" জুটাইল। পুত্রের এই সম্মানে মুগ্ধ হইয়া পিতা বাসা-খরচ জোগাইতে লাগিলেন। সহকারিরূপে লিখিতে লিখিতে যখন নদেরচাঁদ দেখিল, তাহার ডাঁসা হাতে পাক ধরিয়াছে, তখন সম্পাদকপদের পূর্ব্বে 'সহকারী'টা তাহার কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল, সাম্‌নে এত-বড় ভারটা বহন না করিয়া, যাহাতে একায়েক সম্পাদকে পরিণত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সম্মানসূচক একটা চিহ্ন পশ্চাতে সংযুক্ত হয়, সেই চেষ্টাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শেষ নদেরচাঁদ এক কাপ্তেন পাকড়াও করিয়া ফেলিল। তাহার অর্থে ও নিজের সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে এক কাগজ বাহির করিল। বিজ্ঞাপনে লিখিল, "উপন্যাসে যাঁহারা স্কট্, কাব্যে যাঁহারা কালিদাস, নাটকে

যাঁহারা শেক্ষপীয়ার, প্রবন্ধে যাঁহারা এডিসন্, চিন্তায় যাঁহারা এমার্সন্, দর্শনে যাঁহারা কোমত্, তাঁহারাই এই কাগজের লেখক। আর ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই ইহার সম্পাদক।”

নদেরচাঁদ কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিল, কাজেই কলিকাতায় আসিয়া আহারাদি-সম্বন্ধে তাহার প্রথম-প্রথম বড়-একটা ‘বাছবিছ’ ছিল না। লুকাইয়া লুকাইয়া তাহার সকল রকমই চলিত। ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তি তাহার যে কখনও ছিল, ইতিহাসপুরাণে এ সাক্ষ্য দেয় না। তবে সে পিতার বা অন্য কোন গুরুজনের সমক্ষে দেবদ্বিজে গড় হইয়া প্রণাম করিত, জুতা খুলিয়া জল, পানও খাইত। আর সময়ে-অসময়ে বৃদ্ধগণের নিকট হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে দুই-চারিটা মন্তব্যও প্রকাশ করিত।

কাগজ বাহির করার পর নদেরচাঁদ দেখিল, সে যে আশা করিয়াছিল, তাহা পূরিল না। তাহাকে অন্যান্য সম্পাদকগণ আমলই দেন না। বরং কেহ কেহ তাহার লেখাকে আমোদের একটা উপকরণ মনে করেন, আবার এক লজ্জার কথা, শুনিয়া কালাচাঁদের কাল মুখ লাল হইয়া যায়, সবে বলে কি না, নদেরচাঁদ মূর্খ! হায়! হায়!

তবে বুঝি নদেরচাঁদের এত সাধের স্থতা এ হাটে আর বিকায় না! শেষে কি তাহাকে দোকানপাট তুলিতে হইবে? নদেরচাঁদ রাত্রিদিন তাহাই ভাবে! কি করিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে! ভাবিয়া ভাবিয়া নদেরচাঁদ কি-একটা মতলব আঁটিয়া ফেলিল, স্থির করিল, সকল সম্পাদককেই সে একলা "একঘরে" করিবে। বিদ্যা, বুদ্ধি অভিজ্ঞতা—কিসে তাহারা নদেরচাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তাহারা ভাল ইংরাজী জানে, নদেরচাঁদ তা জানে না, এই ত? আচ্ছা ইংরাজীতে পারদর্শী না হইলে কি উপযুক্ত সম্পাদক হওয়া যায় না? ইংরাজী ম্লেচ্ছ ভাষা, তাহা ত বরং না জানাই ভাল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে নদেরচাঁদের সুর ফিরিতে লাগিল। তাহার কাগজ এখন বিশুদ্ধ হিন্দু-পত্রিকায় পরিণত হইতে চলিল। নদেরচাঁদ তখন টেরি মুছিয়া টিকি রাখিল, খানা ছাড়িয়া হবিষ্যান্ন ধরিল! তাড়াতাড়ি মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতার বাংলা অনুবাদ পড়িয়া লইল—নদেরচাঁদ এখন খাঁটি হিন্দু! এতদিনে নদেরচাঁদের আশাবৃক্ষে মুকুল দেখা দিল। তাহার কাগজে হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে লাগিল, তাহা পড়িয়া একশ্রেণীর পাঠকমহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

রব উঠিল, হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দশা নাশিতে, এতকালের পর শঙ্করাচার্য্যের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাইয়াছে।

নব্য হিন্দু নদেরচাঁদ নূতন উৎসাহে, নূতন আশায়, সজোরে কলম চালাইতে আরম্ভ করিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, উদ্ভটনীতি, সকল বিষয়েরই আলোচনা হর্‌দম্ চলিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি সেই স্বভাবসুরসিক সম্পাদকের রসিকতায় পাঠকবর্গ বিস্মিত হইতে লাগিলেন। নদেরচাঁদের কলমের মুখে কিছু বাধে না। কাল যাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে, স্বার্থের খাতিরে আজ ঘোষণা করিল, তাহারা নরকের কীট। নদেরচাঁদ যেরূপ গালি দিতে পারে, তেমন গালাগালি নাকি কেহই দিতে পারে না। মেছুনি হইতে মুদি পর্য্যন্ত সকলেই নদেরচাঁদের এই অসাধারণ ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিত।

নদেরচাঁদের কলম ছুটিল। কোথায় যদি ক্ষুদ্র গোবাঘায় বাছুর ধরিত, নদেরচাঁদ অমনি লিখিত, “ভাইসকল! আর ঘুমাইও না, উঠ, জাগ, ঐ দেখ শার্দ্দূলপ্রবর স্বীয় ভীষণ বদন ব্যাদান করতঃ শনৈঃশনৈঃ পদসঞ্চারে আসিতেছে! আর রক্ষা নাই! পূর্ব্ব হইতে সাবধান হও! এখনও সময় আছে! ইংরাজরাজ্যে আমাদের সব গিয়াছে,

ধরিবার অস্ত্র, ছুড়িবার শস্ত্র, পরিবার বস্ত্র, কিছুই নাই! আমাদের বাহুতে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই; তাই বলি, এখন হইতে সাহস সংগ্রহ কর! এখনও আকাশ নির্ম্মল, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, নিঃশব্দ, ইহার পর, যখন জলদজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে, বায়ু বহিবে, মেঘ গর্জ্জিবে, বৃষ্টি বর্ষিবে, তখন আর উপায় থাকিবে না!"

কোন পুত্র পিতাকে অন্যায়রূপে বিষয় বেনামী করিতে নিষেধ করিতেছে শুনিয়া নদেরচাঁদ লিখিল, "সর্ব্বনাশ হইল, আর রক্ষা নাই, হায় হিন্দুধর্ম্ম, তোমার দুর্গতি দেখিয়া আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না, বুক যে ফাটিয়া যায়, হাত যে অবশ হয়, কলম যে ভাঙিয়া যায়! মনু, অত্রি, হারীত, তোমরা আজ কোথায়! কোথায় আজ সেই বেদবাক্য—

পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

হায় ইংরাজী-শিক্ষা, তোমার আবর্ত্তে পড়িয়া পিতৃভক্তি, মাতৃ-অর্চ্চনা, গুরুজনে সম্মান, সকলই ভাসিয়া গেল! এই ত কলির প্রথম, হায় হায়, না জানি পরে আরও কত কি হইবে!"

মাতাল স্বামীকে আমোদের খরচ জোগাইবার জন্য কোন হিন্দু-স্ত্রী গায়ের গহনা দিতে আপত্তি করিয়াছিল জানিয়া নদেরচাঁদ লিখিল, "হিন্দু-রমণি! তোমরা কি জান না, স্বামীই তোমাদের সর্ব্বস্ব, স্বামীই তোমাদের অলঙ্কার। হিন্দুমহিলা স্বামীর জন্য কিনা করিয়াছেন?— প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন! আর আজ তোমরা সেই কুলে জন্মিয়া, ছি ছি, বলিতে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়, তোমরা কিনা সেই স্বামীর অপমান করিলে? সীতা, সাবিত্রি, সতি, দময়ন্তি, আজ তোমরা কোথায়? কোথায় তোমরা দ্রৌপদি, কুন্তি, অহল্যা, তারা, মন্দোদরি! একবার দেখ, তোমরা যে কুল পবিত্র করিয়াছিলে, আজ সেই কুলে জন্মিয়া, হিন্দুনারী কি করিতেছে? হায় স্ত্রীশিক্ষা, কি কুক্ষণেই তুমি এ দেশে আসিয়াছিলে! ভাই হিন্দু! পদে পদে স্ত্রীশিক্ষার কুফল দেখিয়াও তোমরা চেতিলে না! কত লিখিলাম, কত কাঁদিলাম, কত সাধিলাম, কিছুতেই বুঝিলে না! এখনও বলি, ঐ সর্ব্বনেশে স্ত্রীশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত কর। আর, আর সকল অনিষ্টের আদিকারণ ঐ যে ইংরাজী-শিক্ষা, সেই ইংরাজী-শিক্ষাকে বিদূরিত করিয়া দাও। আর, হে ইংরাজী-শিক্ষায়

শিক্ষিতাভিমানী বিকৃতমস্তিষ্ক হিন্দুকুলাঙ্গার, তোমাকেও বলি,—

"আপনি মজেছ, মজ, লঙ্কা মজায়ো না!"

পরমহিন্দু শ্যামকিঙ্কর শ্বশুরের সহিত সামান্য কারণে বিবাদ বাধাইয়া, সেই 'দাদ্' তুলিবার নিমিত্ত পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনাথা পরিত্যক্তা স্ত্রী পিতার মৃত্যুর পর অযাচিত হইয়া স্বামিগৃহে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসসাগরে, সুখের তরঙ্গে ভাসমান স্বামী সেই কাতরা, রোরুদ্যমানা, উদরান্নলালায়িতা, অসহায়া স্ত্রীর চক্ষের জলে নিজের রসিকতার তরণী ভাসাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। শেষে পবিত্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহের আর কোন সদুপায় না দেখিয়া আত্মীয়-বন্ধুর প্ররোচনায় ও উদ্যোগে শ্যামকিঙ্করের সেই প্রথমা স্ত্রী আদালতের আশ্রয় লন ও "খোরপোষের" টাকার ডিক্রী পান। এই মোকদ্দমার বিচার লইয়া নদেরচাঁদ একটা হৈচৈ বাধাইয়াছিল। পাঠকবর্গকে আমরা নদেরচাঁদের সেই লেখার কিয়দংশ অবগত করাইতেছি।

"হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি

লইয়া স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও হাত দিবার অধিকার নাই। যদি কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে, তবে ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত করা হয়। ইংরাজ-রাজ্যে আমাদের ত সবই গিয়াছে—ধন, মান, গৌরব, যশ, ইংরাজ আমাদের সবই হরিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আমরা, আমরা শুধু ধর্ম্মের মুখ চাহিয়াই বাঁচিয়া আছি, হায়! বুঝি ইংরাজ আর আমাদের সে ধর্ম্মটুকুও রাখে না। ইংরাজ আমাদের কহিনুর লইয়াছে, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি, কিন্তু কোটি কোহিনুর অপেক্ষাও মূল্যবান্ এই যে ধর্ম্ম, এ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা আর সহিবে না। এই মোকদ্দমার এরূপ বিচার করিয়া ইংরাজ আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, মহারাণীর সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। হায় হায়, আর আমাদের রক্ষা নাই। ভাই হিন্দু, এখনও কি তোমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছ, এই কি তোমাদের ঘুমাইবার সময়? আর ত ঘুমাইলে চলিবে না, উঠ, জাগ, দেখ, তোমাদের সর্ব্বনাশ হইল, ইংরাজরাজ্য "মগের মুলুকে" পরিণত হইল! হিন্দু, তোমার ধর্ম্ম যায়, তোমার কর্ম্ম যায়, তোমার সর্ব্বস্ব যায়, তোমার ইহকাল, তোমার পরকাল, সকলই নষ্ট হয়। তাই বলি, আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না। সত্য

বটে আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু দুর্ব্বলের বল কি কেহ নাই ? ধর্ম্ম আমাদের সহায়, তোমরা কি জান না—

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

ধর্ম্মের জন্য হিন্দুগণ কিনা করিতে পারেন, প্রাণও ধর্ম্মের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ!

"অতএব জাগো, জাগো গো সকলে,
রাখ হিন্দুকীর্ত্তি রাখ মহীতলে।
দেখুক ইংরাজ, ধর্ম্মরক্ষা-তরে,
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু শমনে না ডরে॥" ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধটি বাহির হইবার পর একদিন এক "লাল পাগড়ি" নদেরচাঁদকে নাকি কি বলিয়াছিল। সেইদিন রাত্রে বাসায় ফিরিয়া নদেরচাঁদের ভয়ানক জ্বর দেখা দিয়াছিল। জ্বরের ঘোরে, বিকারে নদেরচাঁদ চীৎকার করিয়াছিল, "কে আছ, রক্ষা কর! রক্ষা কর! ঐ ধল্লে! ধল্লে!"

তার পর, বহুকাল, নদেরচাঁদের কাগজে ঐরূপ প্রবন্ধ বা সমালোচনা দেখি নাই। শুনিয়াছি, নদেরচাঁদ নাকি এই জ্বরের পর হইতে তাহার সম্পাদকজন্ম হইতে খালাস পাইয়াছেন!

ঘাত-প্রতিঘাত।

প্রতাপপুরের জমিদার রাজীবলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় প্রতাপ! তাঁকে ভয় না করে, ও অঞ্চলে এমন লোকটি নাই। শিশুকেও সেখানে কল্পিত জুজুর ভয় দেখাইতে হয় না।

বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়ের জমিদারীর আয় খুব বেশী না হইলেও, "পাড়াগেঁয়ে" জমিদারের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এই জমিদারীর অধিকাংশই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। নিকষ কুলীনের সন্তান বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় নিজেও যে প্রথম দুইবারের বিবাহে এরূপ যৌতুক না পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। সুতরাং বলিতে গেলে, এই জমিদারীর সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়ের সম্বন্ধটা বংশাবলী-ক্রমে মধুররসাত্মক। বোধ হয়, এই কারণেই বন্দ্যোপাধ্যায় সময়ে-অসময়ে, আবশ্যকে-অনাবশ্যকে, প্রজাবৃন্দকে সেই

মধুররসের সম্বন্ধ ধরিয়া সম্বোধন করিতেন। প্রজারা কিন্তু এ সম্বোধনের মাধুর্য্য কতদূর অনুভব করিত, বলা যায় না। আর এক কথা, রাজীবের প্রকৃতি "বড় উদার!" "বসুধৈব কুটুম্বকম্" উদারচেতার লক্ষণ! সেজন্যও বোধ হয় রাজীব, কর্ম্মচারী, প্রজা এবং শত্রু, সকলকেই সমভাবে "বড় কুটুম্ব" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন।

রাজীবের তিনটি অর্দ্ধাঙ্গিনী, তিনটিই জীবিত। কিন্তু তিনটিতেও রাজীবের অর্দ্ধাঙ্গ পূরণ হইত না। কাজেই পরম হিন্দু রাজীব সে অভাবটুকু অন্য উপায়ে পূরণ করিয়া লইতেন!

কিন্তু এ সংসারে সব সুখ নাকি ঘটে না। তাই ত্রি-সংসার-সত্ত্বেও রাজীব অপুত্রক। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" শাস্ত্রের এই মহাবাক্য রাজীব একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিন বার প্রতিপালন করিলেন. কিন্তু হায় এত করিয়াও তাঁর আশা ত পূরিল না! যাগ-যজ্ঞ-পূজা কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন মনের দুঃখে রাজীব সংসারধর্ম্মে ইতি দেওয়াই স্থির করিতেছিলেন, সহসা একটা পুনশ্চ লিখিতে সাধ হইল! সাধ যদি হইল, তবে তা সাধিতে কতক্ষণ? এক সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী, বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থপক্ষের গৃহিণী

হইলেন। কিসে কি হয় বলা যায় না, নূতন গৃহিণীর কৃপায় বৎসরের ভিতরেই রাজীব পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন। সুখের সাগর উথলিয়া উঠিল। আর এতদিন "পুন্নাম"-নরকের যে ভয় ছিল, তাহাও দূর হইল।

বন্দ্যোপাধ্যায় যে খাঁটি হিন্দু, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্ধ্যা-আহ্নিক-পূজা, এ সকল ত তাঁর যথারীতি করা আছেই, তার উপর মুখে হরিনামের বুলি এবং হাতে হরিনামের ঝুলি, একদণ্ডও ছাড়া নাই। দুষ্ট লোকের কথা স্বতন্ত্র, তারা গোপনে কত কথাই বলে। হরিনামের ছলে কার কোন্ সম্পত্তিটি আত্মসাৎ করিবে, চক্ষু বুজিয়া নিশ্চিন্তমনে, কুঁড়োজালি হাতে, কুড়া নাকি মনে মনে তারই হিসাব করে। আর পূজা করিতে করিতে কোন্ শত্রুর প্রতি কিরূপে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে, সেই ফন্দীই আঁচে। রাগটা আবার কখনও কখনও শালগ্রাম-শিলার উপর দিয়াও যায়। কিন্তু বাজে লোকের বাজে কথায় আমাদের কাজ নাই। আমরা জানি, অলকাতিলকাধারী রাজীব পরম বৈষ্ণব। আর রাজীব যে কেবল নিজে ধর্ম্মাচরণ করিয়াই ক্ষান্ত, তা-ও নয়, অনাচারী অধার্ম্মিকের দমনেও তাঁর দৃঢ় অনুরাগ। যদি কেহ সামাজিক কোন আচারব্যবহারের কেন্দ্র হইতে

চুলমাত্র সরিয়া যায়, তবে তার আর রক্ষা নাই, রাজীব তাকে একঘরে না করিয়া ছাড়েন না। তবে নিতান্ত অনুগতের প্রতি তাঁর শাস্ত্রে যে দুই-একটা বর্জ্জিত বিধি না ছিল, এমনও বলা যায় না।

ছেলেটি জন্মিবার পর হইতে, রাজীবের সংসারে আর-একটু আঁট হইল। ধর্ম্মের উপরও ভক্তিটা যেন কিছু বেশী-বেশী হইয়া উঠিল। শুনিয়াছি, এর পর তিনি কিছুতেই আদালতে হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তবে, মামলা-মোকদ্দমা সাজাইতে ও সাক্ষিসাবুদ শিখাইতে অবশ্য তাঁর কোন আপত্তি ছিল না।

বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র। লোকে বলিত, কৃষ্ণভক্ত রাজীব পুত্রনামের ছলে কৃষ্ণনাম লইতেন। বাজে খরচ তাঁর আদৌ ছিল না।

কৃষ্ণচন্দ্র রাজীবের বৃদ্ধ বয়সের, বিশেষত চতুর্থ পক্ষের একমাত্র পুত্র, তার যত্নের কথায় আর কাজ কি? পিতা, মাতা, উভয় দিক্ হইতেই আদরের স্রোত কিছু খরতর বহিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র সেই আদরের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে ক্রমে যৌবনসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দিনে দিনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্র ষোল-

কলায় পূরিয়া উঠিলেন। যৌবনসমুদ্র উছলিয়া পড়িল। সে জোয়ারের জলে গ্রামবাসী গৃহস্থের দল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল!

আঠার-বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র ঝোঁক ধরিলেন, গ্রামের স্কুলে তেমন ভাল পড়া হয় না, কলিকাতায় পড়িতে হইবে। অনেক ওজর-আপত্তি কান্নাকাটি উঠিল, শেষ কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের জেদই বজায় রহিল। শুভদিনে শুভক্ষণে পরিচারকবৃন্দপরিবৃত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন, 'পড়া' আরম্ভ হইল।

ইংরাজি-বিদ্যার আলোকে অতি অল্প দিনেই কৃষ্ণচন্দ্রের কুসংস্কার-তমস দূরে পলাইল! তখন আর পানাহারের কোন 'বাছবিছ' রহিল না! বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যদি কেহ তামাসার ছলে কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিত, "তোমার বাবা অত শুদ্ধাচারী, লক্ষ হরিনাম ভিন্ন জলগ্রহণ করেন না, আর তোমার এ অনাচার-অধর্ম্ম কেন?" তখন কৃষ্ণচন্দ্র একটু রঙে চড়িয়া জবাব গাহিতেন, "আরে বোঝ না, বাবা ধর্ম্মের দিকে বড় বেশী ঝুঁকেছেন, আমি যদি এদিকে একটু না ঝুঁকি, তবে দাঁড়িপাল্লা ঠিক থাকে কৈ?"

রাজীবলোচনের অন্য দিকে সিকি পয়সা অপব্যয় না থাকিলেও, পুত্রের খরচ জোগাইতে কোনরূপ কার্পণ্য ছিল

না। এর উপর কৃষ্ণচন্দ্র নানা অছিলায় মায়ের নিকট হইতেও মাঝে মাঝে কোন্ দুশ-একশ না লইতেন? সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের যদৃচ্ছ পানাহার অবাধে চলিতে লাগিল। ক্রমে আহার-বিহারটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের হইয়া উঠিল। পরম্পরায় পুত্রের এই "অনাচার-অবিচারের" কথা রাজীবেরও কাণে গেল। একবার ছুটিতে কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ী আসিলে, রাজীব জনরবের কথা পুত্রকে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কথা কি সত্য?" কৃষ্ণচন্দ্র ছেলাবেলা হইতেই পিতাকে বড়-একটা 'ভয়-ডর' করিতেন না, এখন ত ইংরাজী পড়িয়া স্বাধীনচেতা হইয়াছেন, পিতার কথায় অবিচলিতভাবে উত্তর দিলেন, "দোষের কোন আচরণ করি না, তবে সংস্কৃতশিক্ষার আমলে টিকি-ফোঁটা-নামাবলী যেমন চলিত ছিল, এখন আমরাও যা করি, তা-ও তেমনি ইংরাজীবিদ্যার অঙ্গ,—সভ্যতার লক্ষণ।" রাজীব ভাবিলেন, "হবেও বা, কলিকাল!" কিন্তু শীঘ্রই রাজীবের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিল, ক্রমে পুত্রের এই সব ইংরাজী-সভ্যতা যে কি, তাহা প্রত্যক্ষীভূত করিতে লাগিলেন! দেখিয়া দেখিয়া রাজীব কেবল নিজ কপালে করাঘাত করিতেন। এখন ত আর অন্য কোন

উপায় নাই! হায়, এখন যে হাত চেয়ে আম বিস্তর ডাগর হইয়া উঠিয়াছে! রাজীব আরও জানিলেন, গোপনে তাঁর পুত্র সভ্যতার মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া বিস্তর টাকা ঋণ করিয়া বসিয়াছেন! রাজীবের তখন শেষ অবস্থা। বার্দ্ধক্যে এবং জরায়, তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া আসিতেছিল। সেই অন্তিমে, পুত্রের ও বিষয়ের পরিণাম ভাবিয়া, নিজের এই পরিণামে তিনি হরিনাম ভুলিয়া গেলেন! তৈলহীন প্রদীপ যেমন অন্তিমে দারুণ জ্বালা বুকে জ্বালিয়া নিবিয়া যায়, রাজীবের জীবনপ্রদীপও তেমনি শেষে বড় জ্বলিয়া-পুঁড়িয়া নিবিয়া গেল! অন্তিম-শয্যায়, শেষ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরিয়া রাজীব দুইটি অনুরোধ করিয়া যান! রাজীব উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কৃষ্ণ-চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"বাপু, দেখো, যেন অন্নপাপটা আমার বংশে না হয়, আর যে দেনা করেছ, তা আমি যে টাকা রেখে যাচ্চি, তাই হ'তে শোধ দিও। এখন আর অপব্যয় করো না, ধার করো না, বিষয়-আশয়গুলিও নষ্ট করো না, লক্ষ্মীবাপ্ আমার!" বৃদ্ধের আর কথা সরিল না, একবিন্দু অশ্রুও নাকি সেই শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর অপাঙ্গে দেখা দিয়াছিল!

আমরা জানি, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পিতার এই অন্তিম অনুরোধের প্রথমটি বরাবরই রক্ষা করিয়াছিলেন। উইল্‌-সন্ হোটেলে খানার সময়ে "রাইস্" (Rice) দিতে আসিলে, কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া উঠিতেন, "ওটা আর দিও না, পিতৃ-আজ্ঞা,—অন্নপাপ করা হবে না!" দ্বিতীয় আদেশ প্রতিপালনে তিনি যে বিশেষ সমর্থ হইয়াছিলেন, এমনটি বলিতে পারি না! পিতার মৃত্যুর পর, কৃষ্ণচন্দ্রের খরচ অধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল, তবে এ সকলকে তিনি অবশ্য অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন না! এই ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের আর একটা খেয়াল চাপিয়াছিল, তিনি বুঝিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে একটা টাইটেল্—রাজা কি নিতান্তপক্ষে প্রথমবারে রায়-বাহাদুর না লইতে পারিলে, তাঁর বাবুয়ানা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে! এ অসম্পূর্ণতা দূর করিতে কৃষ্ণচন্দ্র যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই! জলের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন! শুনিতে পাই, তাঁহার এত চেষ্টা ও অর্থব্যয় নিতান্ত বৃথায় যায় নাই, তবে টাইটেল্‌গ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁর বিষয়গুলি ঋণরাহুগ্রস্ত হইয়াছিল!

কব্‌রেজ মশায়।

কালাচাঁদ তার বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, সবে-ধন-নীলমণি, তায় আবার সে শেষ বয়সের ছেলে; আত্মীয়ের আদরে, কুটুম্বের যত্নে, প্রতিবেশীর সোহাগে কালাচাঁদ দিনদিন কলায় কলায় পূরিতে লাগিল, দেখিয়া পিতামাতার প্রফুল্ল হৃৎপদ্ম নাচিয়া উঠিল।

'কালাচাঁদ' নামটি নিরর্থক নহে; শুনিয়াছি, ঐ নামের ভিতরে নাকি কি-একটা গভীর বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত আছে। কালাচাঁদের রং কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ ঘোর, কিন্তু ঠিক বার্ণিশ নহে, মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলেরই অনুরূপ! সুগোল মসৃণ মুখখানি দেখিলে মনে হয়, কবির উপমা নিতান্ত অমূলক নহে। সত্যই যেন সে মুখখানি দেখিয়া—

"কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।"

কালাচাঁদ যখন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল,

দাঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, তখন বাস্তবিকই সে দৃশ্য অদ্ভুত মনে হইয়াছিল! কবির ভাষায় উপমাসহিত বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, যেন গুজরাটি হস্তিশাবক পূর্ব্ব-জন্মের পুণ্যফলে মনুষ্যশিশুরূপে বঙ্গভূমে ভ্রমিতেছে! ডার্‌উইনের কল্যাণে বোধ হয় শুঁড়টির আর কোন কৈফিয়তই দিতে হইবে না।

কালাচাঁদের বাল্যজীবন রহস্যসঙ্কুল,—পঙ্কিল বলিতেছি না—আমরা তাহা ভেদ করিতে পারি নাই! চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষের মত কালাচাঁদের সে জীবনপরিচ্ছেদ ঘোর অন্ধকারময়! তাহার শুক্লপক্ষের জীবন-আলোকই সাধারণে প্রকাশ! আমরা সেই অংশেরই আলোচনা করিব।

বিংশতিবর্ষীয় কালাচাঁদ কলিকাতায় উমেদার। পরের বাসায় থাকিয়া, বিবিধ কষ্ট সহিয়া, বিস্তর হাঁটাহাটি করিয়া, অনেক মুরুব্বি ধরিয়া, কালাচাঁদ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। এন্‌ট্রান্স পাস্, অন্ততঃ ইংরাজিতে মোটা-মুটি জ্ঞান ভিন্ন কোন আফিসেই ঢুকিবার সুবিধা নাই, সুতরাং ম্লেচ্ছভাষা-বিদ্বেষী কালাচাঁদকে কলিকাতাসহরে চাকরির চেষ্টায় ইস্তফা দিতে হইল! কিন্তু পৃথিবীতে কিছুই বৃথা যায় না, কাজেই কালাচাঁদের উমেদারির ব্যর্থ

চেষ্টার কালও নিতান্ত বৃথায় গেল না! নানা স্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের সহিত পরিচয় করিয়া, কালাচাঁদ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

কালাচাঁদ কলিকাতায় যে বাসায় থাকিয়া উমেদারি করিত, তাহার নিকটে একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার ঔষধালয়টি প্রকাণ্ড, ঔষধের কাট্‌তিও যথেষ্ট! কালাচাঁদ অধিকাংশ সময়েই সেই ঔষধালয়ের কর্ম্মচারী-দের নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাম্রকূটের ধূমের সহিত, বিবিধ গল্প গলাধঃকরণ করিত, আর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি ও আর আর কার্য্যপ্রণালীও বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিত। এইরূপে কিছুদিন যায়, ক্রমে স্বয়ং কবিরাজ-মহাশয়ের সহিত কালাচাঁদের পরিচয় হইল, পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এবং ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইল! কালাচাঁদ সুবিধা পাইলেই আপনার অবস্থার কথা কবিরাজ-মহাশয়কে শুনাইত। সহৃদয় কবিরাজ-মহাশয়, ছলছল-চক্ষু কালাচাঁদের বিষণ্ণ মুখে তাহার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা বিশেষ সহানুভূতির সহিত শুনিতেন। স্নেহপরবশ হইয়া তিনি স্বয়ংও কোথাও কোথাও কালাচাঁদের

জন্য অনুরোধও করিতেন; কিন্তু কালাচাঁদের ভাগ্য-ক্রমে,—ভাল কি মন্দ, বলিতে পারি না—এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সকলই বিফল হইল! চাকরির কর্ম্মভোগ বুঝি বিধাতা কালাচাঁদের কপালে লিখেন নাই! এইরূপে নিরাশার জলদজালে কালাচাঁদ অন্ধকার দেখিতেছিল, সহসা একটা বিদ্যুতের আলোয় সে আপনার গন্তব্য-পথ দেখিতে পাইল! সহসা কালাচাঁদ একদিন সময় বুঝিয়া কবিরাজ-মহাশয়কে ধরিয়া বসিল। "আপনি অনুগ্রহ না করিলে আমার আর উপায় নাই" ইত্যাদি কাতরোক্তিতে কবিরাজ-মহাশয়কে সে বিচলিত করিয়া তুলিল! দয়ার্দ্রচিত্ত কবিরাজ-মহাশয় হৃদয়ের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমার দ্বারা যাহা সম্ভব, তোমার জন্য আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" কবিরাজ-মহাশয়ের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে কালাচাঁদ বলিল, "আমাকে আপনার ছাত্র করিয়া লইতে হইবে।" কালাচাঁদকে ছাত্র! কবিরাজ-মহাশয় ত আকাশ হইতে পড়িলেন! সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বৈদ্যসন্তান না হইলে, কবিরাজ-মহাশয় কাহাকেও 'ছাত্র'রূপে গ্রহণ করেন না। তখন অতিমাত্র-বিস্মিত কবিরাজ-মহাশয় কায়স্থকুলতিলক

কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংস্কৃত কিছু জানা আছে কি?" কালাচাঁদের উত্তর—"ফলেন পরিচীয়তে।" যদিও ব্যাপার বুঝিতে তাঁর বাকী রহিল না, তথাপি সত্য-প্রতিজ্ঞ কবিরাজ-মহাশয় একটু হাসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন। কালাচাঁদকে আর পায় কে? শুভ-দিনে শুভক্ষণে কালাচাঁদ পাঠ আরম্ভ করিল। মাস-কয়েক যাইতে না যাইতে কবিরাজ-মহাশয় দেখিলেন, শাস্ত্রসম্বন্ধে, তা যে কোন শাস্ত্রই হোক্ না কেন, কথা উঠিলেই কালাচাঁদ পরম বিজ্ঞের মত তাহাতে টিপ্পনী কাটিত। ভালমানুষ কবিরাজ-মহাশয় একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কালাচাঁদ আমাদের শাস্ত্র না পড়েই দেখ্ছি শাস্ত্রী হ'য়ে উঠেছে!" আর যাবে কোথা? কালাচাঁদ অমনি গললগ্নীকৃতবাসে গুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া বলিল, "'উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে' —তথাপি গুরুবাক্য অন্যথা হয় না! শ্রীমুখ হইতে আমার ভাগ্যে যে 'উপাধি' নির্গত হইয়াছে, তাহাই আমাকে অর্পণ করা হোক্!" কবিরাজ-মহাশয় হো হো হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তথাস্তু।" কালাচাঁদ এখন আর শুধু কালাচাঁদ নহে, শাস্ত্রী কালাচাঁদ! তখন হইতে

কবিরাজ-মহাশয়ের পরিচিত সকলেই তাহাকে "শাস্ত্রী" বলিয়া ডাকিতেন! আমরাও এখন হইতে কালাচাঁদকে "শাস্ত্রী" বলিব! এই মানহানির মোকদ্দমার দিনে মান বাড়াইয়া মান রাখাই ভাল!

*　　*　　*　　*

কালাচাঁদ, কবিরাজ কালাচাঁদ শাস্ত্রিরূপে অচিরাৎ তাঁহার জন্মভূমিতে দেখা দিলেন! তথায় বৎসর-দুয়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গে 'বৈদ্য'রূপে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু 'চিকিৎসক'-নামে—"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ" এমনটি যেন কেহ মনে করিবেন না,—প্রকৃত 'চিকিৎসক'-নামে প্রখ্যাত হইতে দেশে বহু বিলম্ব বুঝিয়া, শাস্ত্রী কালাচাঁদ কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করাই স্থির করিলেন। বিশেষ অল্পদিন হইল, তাঁহার গুরুদেব কবিরাজ-মহাশয় পরলোক-গমন করিয়াছেন, এক্ষণে কলিকাতায় কিছু সুবিধা হইবে, এ ধারণাও তাঁর জন্মিয়াছিল। গুরুদেবের অবর্ত্তমানে নিরঙ্কুশভাবে বিদ্যা-জাহিরের জন্য কালাচাঁদ কলিকাতায় আসিতেছেন, এ কথা

ভাবিতেও পাপ স্পর্শে, কেবল গুরুদেবের 'পশারে' বসিতেই কালাচাঁদের কলিকাতায় আগমনের বাসনা।

কালাচাঁদের কয়েকজন আত্মীয় কলিকাতায় কাজ করিতেন, তাঁহারা একটি বাসা ভাড়া লইয়া মেস্ করিয়া থাকিতেন। বাসার নীচে, বাহিরের দিকের ঘরটি ছোট না হইলেও তাঁহাদের কোন ব্যবহারে আসিত না। কালাচাঁদ অতি স্থলভে সেই ঘরটি ভাড়া করিয়া মেসের মেম্বরভুক্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ঘরটির শ্রী যেন ফিরিয়া গেল। সম্মুখের দুই দরজায় সার্সি বসিল, ভিতরের দেওয়াল পেন্‌টিংয়ে স্থশোভিত হইল, কড়িতে টানা-পাখা ঝুলিল। আর আল্‌মারি, গ্লাস্‌কেস্, ঔষধের শিশি, তৈলের বোতল, মোদকের জার প্রভৃতি শূন্য ঘরখানি পূর্ণ করিয়া দিল। গৃহপ্রবেশের পথে, সম্মুখের দেওয়ালে প্রকাণ্ড এক সাইন্‌বোর্ড; তাহাতে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত "ধন্বন্তরি ভৈষজ্যালয়"। ভিষগাচার্য্য স্বয়ং স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ "——" কবিরাজের প্রিয় ও প্রধানতম ছাত্র কবিরাজ কালাচাঁদ শাস্ত্রী। কলিকাতায় বসিতে না বসিতে টিকির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নানা ফন্দিও কালাচাঁদের উর্ব্বর মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল।

গুম্ফশ্মশ্রুর রেখা জ্যামিতির 'বিন্দুর' মাত্রায় হইলেও, কালাচাঁদ তাহা মুণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। দুষ্ট লোকে বলিত, এটা কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কালাচাঁদের পক্ষে বাজে খরচ: এখন কালাচাঁদের বেষ হইল—গায়ে লংক্লথের চাদর, পরণে ৪৯,—"বাই" নহে—রেলি। চরণে তালতলা, অবশ্য চটি।

বাসার নিকটে ছ্যাক্‌রা গাড়ির আড্ডা, গাড়োয়ানদের সহিত কালাচাঁদের কি বন্দোবস্ত জানি না, দুইএকখানি গাড়ি সর্ব্বদাই ভৈষজ্যালয়ের সম্মুখে অপেক্ষা করিত, কিন্তু ছুটো ভাড়া পাইলেই আবার চলিয়া যাইত। এদিকে সজ্জিত কালাচাঁদ ঔষধালয়ে সর্ব্বদাই এমন ব্যস্তভাবে থাকিতেন যে, আগন্তুক তাঁহাকে দেখিলেই মনে করিত, কবিরাজ-মহাশয় এখনই বুঝি ঐ গাড়িতে কোন 'কলে' যাইবেন। তা 'কল্‌' থাক্‌ বা না থাক্‌, ফল হোক্‌ আর নাই হোক্‌, কালাচাঁদের গাড়ি চড়ার কামাই ছিল না। করধৃত ইংরাজি সংবাদপত্রে নিবিষ্টচক্ষু কালাচাঁদ ঔষধের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া কলিকাতার নানা স্থানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিতেন, আর গাড়ি হইতে নামিয়া ত্রস্তগতিতে ঔষধালয়ের প্রবেশদ্বারে বিলম্বিত শ্লেটে লিখিত নামের

দুই-চারিটা কাটিয়া দিতেন। গোটাকত নূতন নাম সংযুক্ত হইত। এইপ্রকারে কালাচাঁদের কাজ না থাকিলেও অবসরমাত্র ছিল না। গাড়ি হইতে নামিয়াই অপরাহ্নে পুঞ্জীকৃত পুঁথির মধ্যে বসিয়া কালাচাঁদ দুই-তিনটি ছাত্রকে পাঠ দিতেন। যদিও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি কালাচাঁদের ভক্তি বড় প্রবলা, এবং বাছিয়া বাছিয়া "বড়লোক-ঘেঁষা" পণ্ডিতকে তিনি মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামীও প্রদান করিতেন, তথাপি ছাত্রদের পাঠ দিবার সময় পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রবেশ নিষেধ ছিল। কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বড়ই গোলযোগ করেন, তাহাতে পাঠনাক্রিয়ার ঐকান্তিক ব্যাঘাত জন্মে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছাড়া কয়েকজন নরসুন্দরকেও কালাচাঁদ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাহারাও প্রতিদানে ক্ষৌরকার্য্য করিতে করিতে গল্পচ্ছলে পাড়ায় পাড়ায় শাস্ত্রী কবিরাজের সুচিকিৎসা, পাণ্ডিত্য ও দয়াদাক্ষিণ্যের অশেষ সুখ্যাতি করিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক শাস্ত্রীর দয়াদাক্ষিণ্য নিতান্ত "অসামান্য" ছিল না। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত দাতব্য ঔষধবিতরণ ত ছিলই, তাহার উপর স্থানবিশেষে অবস্থা বুঝিয়া কেবল ডাকমাশুল অর্থাৎ গাড়িভাড়ার

১।০ পাঁচ-সিকা, কি ১॥০ দেড়টাকা মাত্র লইয়াই কবিরাজ-মহাশয় single fairএ double journey—দুই বারও রোগীর গৃহে গমন করিতেন।

*　　*　　*　　*

নববর্ষে কবিরাজ শাস্ত্রী মহাশয়ের অমূল্য—বিতরণের জন্য—পঞ্জিকা বাহির হইল। তাহাতে অপূর্ব্ব ঔষধ ও তৈলাদির বিজ্ঞাপন! পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সর্ব্বরোগ-(রোগী নয়) সংহারিণী, মহাশক্তি সালসার কথা! আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া, রোগিবৃন্দকে অভয় দিবার জন্য অভয়া মহাশক্তির প্রসাদে এই সুধা শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। শাস্ত্রীর মেসের কেহ কেহ কিন্তু বলিতেন—"ও শুধু অনন্তমূল আর 'পটাস্'বিশেষে প্রস্তুত!" তা সে কথা ছাড়িয়া দাও—এ সব ত নিন্দকের রটনা। তার পর "বিশল্যকরণী"র কথা। সর্ব্বপ্রকার অম্ল ও শূল নিবারিণী (ব্যাকরণদোষ ধরিবেন না, এ সব শাস্ত্রীর আর্ষপ্রয়োগ) প্রলেপ ও মোদক! এ বিজ্ঞাপনেরও একটু নমুনা দি। "যে বিশল্যকরণী রাবণের শক্তিশেলে মৃত্যুমুখে পতিত লক্ষ্মণকে জীবনদান করিয়াছিল, এ সেই বিশল্যকরণী! কলিতে শক্তিশেলস্বরূপ অম্লশূল হইতে

মনুষ্যগণকে রক্ষা করিতে শাস্ত্রী স্বয়ং বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ-গন্ধমাদন আলোড়িত করিয়া এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।" ইহা ছাড়া এই কল্পতরু পুস্তকে নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, হিষ্টিরিয়া, বাত প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ার অমোঘ ঔষধের বিজ্ঞাপন ত আছেই!

কিন্তু সব চেয়ে বিজ্ঞাপনের বাহার "পারিজাতরস" তৈলের! ঐ তৈলের গুণবর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয় অপারগ হইয়া লিখিয়াছেন—

"আকাশমণ্ডলের তারকারাশি, সমুদ্রতীরের বালুকাকণা, হিমালয়ের উপলখণ্ড গণনা করা বরং সম্ভব, তথাপি ইহার গুণের সংখ্যা করা যায় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া যে পারিজাত,—একটিমাত্র পারিজাত আনিয়া মহিষীর মন রাখিয়াছিলেন, এ সেই অমরবাঞ্ছিত পারিজাতপুষ্পের সারভাগের তরল অংশের রাসায়নিক সংযোগে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, দার্শনিক মতে প্রস্তুত! গ্রাহক, তোমায় কিন্তু ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না, স্বর্গে উঠিবার কষ্টও সহিতে হইবে না, সুদর্শনচক্রের সাহায্যও লইতে হইবে না, কেবল একটিমাত্র রৌপ্যচক্রের বিনিময়ে এ অমূল্য তৈল সংগ্রহ কর!

ঘরে বসিয়া এহেন সুলভে গৃহিণীর মনস্তুষ্টি করিতে বিরত হইও না; কেন না, শাস্ত্রে বলে—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্!'"

"তুমি কেরাণী, আপিসের বড়-সাহেব যদি তোমার প্রতি সহসা ক্ষিপ্ত হন, তবে তাঁহার সবুট গৌরচরণে আর সরিষার তৈল মর্দ্দনের প্রয়োজন হইবে না, এক-শিশি—শুধু একশিশিমাত্র পারিজাত-তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেই তিনি 'জল' হইয়া যাইবেন. তখন তুমি অনায়াসেই সেই সুখের সাগরে হাবুডুবু খাইতে পারিবে। হে গ্রাহক, ইহার তুল্য তৈল কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই,—'কি সৌরভে, কি গৌরবে, কে এর তুলনা হবে!' ইহার দ্বিতীয় নাই—'নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দনামে!'"

এই তৈলের প্রশংসাপত্রের সংখ্যা করা যায় না। 'কল্পনা'-গ্রামের পঞ্চায়তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অসত্যবাদী মণ্ডল স্বহস্তে লিখিয়াছেন—"শাস্ত্রী মহাশয়, আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। বাস্তবিকই আপনার পারিজাত-রসের অশেষ গুণ, ইহা যে কেবল মানবজাতির শরীরের ও মনের স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, তাহা নহে, ইহা দ্বারা অনেক অসাধ্য-সাধনাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। সম্প্রতি আমার

একটি গোবৎস দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছিল, কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, শেষে আমার দুই-বৎসরের কন্যাটি তাহার স্বাভাবিক উপস্থিতবুদ্ধির প্রাখর্য্যে একটু পারিজাতরস গোঁজে দিবামাত্র, কোথা হইতে হাম্বা-হাম্বা-রবে গোবৎসটি সেই গোঁজের নিকট আসিয়া, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দড়িগাছটি আপনি গলায় দিল। কি স্নায়বিক আকর্ষণ! আপনার কথা ঠিক জ্বলন্ত সত্য! কবিরাজ-মহাশয়, আপনি প্রকৃতই কলির ধন্বন্তরি, যথার্থই মর্ত্ত্যের অশ্বিনীকুমারযুগল! মহাদেব আপনার মঙ্গল করুন।"

এমন একখানি নয়, দুইখানি নয়, শত শত প্রশংসা-পত্র! কেবল বাঙালী নয়, হিন্দু নয়, মেটেবুরুজের নবাবসৌধ-সন্নিকটস্থ পশ্চিম-দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান, এমন কি, সুদূর চূণাগলির বিশিষ্ট ইংরাজমহিলাগণও এ তৈল ব্যবহারে মুগ্ধ। কিন্তু কি দুর্ব্বিপাক—যেমন কুসুমের কীট, চন্দ্রের কলঙ্ক, আলোকের ছায়া চিরসঙ্গী, তেমনই এ পারিজাতরসেরও ভেল সঙ্গী বাহির হইল। ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার জন্য,—হোক্ আর না হোক্,—দুষ্টের দমনের জন্য শাস্ত্রী মহাশয় জালিয়াতদের নামে দুই-নম্বর

নালিশও রুজু করেন, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের কেমন সহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতা, এই মোকদ্দমার আসামী-পক্ষের সমস্ত ব্যয়, এমন কি, তাহাদের অর্থদণ্ডের ভারটাও তিনি স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। এদিকে আবার শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্ম এতই নিষ্কাম যে, তাঁহার এ দানের কথা পরম আত্মীয়দিগকেও তিনি জানিতে দেন নাই। নিজের উকীলকেও নহে! কিন্তু এ সংসারে যাহার উপকার করা যায়, সে-ই নাকি অকৃতজ্ঞতা দেখায়, উপকারী বন্ধুর নিন্দা করিয়া বেড়ায়, তাই বুঝি কালাচাঁদের এই মহত্ত্ব বিকৃতভাবে রূপান্তরিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে।

তা যাই হোক্, কালাচাঁদ এইপ্রকার উদারতা, সহৃদয়তা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই সুদূর মফস্বলেও সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মফস্বল হইতে "কল্" আসিতে আরম্ভ হইল। দুষ্ট লোকে বলে, জেলায় জেলায় শাস্ত্রীর দালাল ঘুরিয়া বেড়ায়! তা সে কথায় কর্ণপাত না করাই ভাল। এখন শাস্ত্রীর মফস্বলের চিকিৎসা-প্রণালীর একটু আলোচনা করা যাক্। যশোহরের কোন পল্লীগ্রামে এক ধনী গোপ-

নন্দন পুরাতন জটিল পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, স্থানীয় কবিরাজের চিকিৎসায় শীঘ্র সুফল ফলিতেছিল না, কি সুযোগে কালাচাঁদ এ সংবাদ অবগত হইয়া রোগী "ফুরণ" করিয়া সশরীর তথায় উপনীত হইলেন। রোগীর গৃহে পৌঁছিয়াই শাস্ত্রী অতি যত্নের সহিত স্থানীয় কবিরাজের মুখে তাঁহার কৃত ব্যবস্থার বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন! সেই ব্যবস্থার মধ্যে "পঞ্চকোল" ছিল। পঞ্চকোলের নামশ্রবণমাত্রেই শাস্ত্রী গম্ভীরভাবে——

"পঞ্চকোলেন ঝোলেন
ভুক্ত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ"

শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন, "এ ব্যবস্থাটা অবশ্য শাস্ত্রোক্ত বটে, কিন্তু কি জানেন কবিরাজমশায়, সকল সময় কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে চলে না। তা আপনার দোষই বা কি দিব, প্রথম-প্রথম ও রোগটা আমাদেরও ছিল, হাঃ, হাঃ, বুঝেছেন কি না, সকল বিষয়েই কিঞ্চিৎ—ওর-নাম-কি—বুদ্ধিবিবেচনার দরকার, হাঃ, হাঃ, হাঃ, কইরে আমার বাক্সটা নিয়ে আয় ত!" তার পর কালাচাঁদ হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের মত কয়টা বটিকা বাহির করিয়া বলিলেন যে, "যে ঔষধ ব্যবহার হইতেছিল, তাহা সহসা

বন্ধ করার প্রয়োজন নাই, তবে সেই ঔষধ সেবনের এক এক ঘণ্টা পরে এই বটিকার এক একটি সেবনীয়। একের পৃষ্ঠে শূন্যের ন্যায় এই বটিকা পূর্ব্ব ঔষধের কার্য্যকারিতা দশগুণ বৃদ্ধি করিবে।" গ্রাম্য কবিরাজ-মহাশয় শাস্ত্রীর অভিনব শাস্ত্রজ্ঞান এবং চিকিৎসাপ্রণালী দর্শনে অবাক্ হইতেছিলেন, এমন-সময় শাস্ত্রী মহাশয় আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "এক্ষণে পথ্যাদিসম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করেন?" উত্তরে মাগুর মৎস্যের ঝোলের কথা শুনিয়া শাস্ত্রী "আরে রাম রাম, কবিরাজ-মশায় বলেন কি, মদ্গুর মৎস্য কি এ অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে!"—বলিয়া 'তার-স্বরে' গ্রাম্য কবিরাজের ভীতির এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বিস্ময়ের মাত্রা অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়া শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন—

"'রোহিতে মোহিতঃ পিতা
মদ্গুরো মদ্গুরোঃ প্রিয়ঃ।
শকুলে আকুলা ভার্য্যা
কবজী মম জীবনম্॥'—

শুনিলেন কবিরাজ-মশায়, শাস্ত্রের বচন ত শুনিলেন? এ ক্ষেত্রে, কবজী কিনা কৈ মৎস্যের ঝোলই প্রশস্ত!"

ইহার পর হইতে এ অঞ্চলে সাধারণ লোকের মুখে "কব্‌রেজ ত কল্‌কাতার কালাচাঁদ"—একটা প্রবাদের মত হইয়া পড়িল। সুযোগ ও সময় বুঝিয়া কলিকাতার গুণগ্রাহী সংবাদপত্র 'মধুকর' গুন্‌গুন্‌-রবে কালাচাঁদের গুণগানে মন দিলেন। আর এইরূপে দিনে দিনে শাস্ত্রীর যশঃসৌরভে দশদিক্‌ আমোদিত হইতে লাগিল।

আমার সম্পাদকী।

আমিও একদিন সম্পাদক হইয়াছিলাম, সে ধৃষ্টতা আমার মাপ করিবেন। আমার ধারণা ছিল, সভাপতি এবং সম্পাদক হওয়া সহজ। পতাকার দণ্ডটাই খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কাপড়ের টুক্‌রা তাহার সর্ব্বোচ্চে উড়িয়া মাং করিয়া তোলে—তাহার ভার নাই, মূল্য যৎসামান্য, কিন্তু সে-ই ত বাতাসে ফর্‌ফরায়তে;—বড় আশা করিয়াছিলাম, লেখকদের শিরঃস্থানে ভর করিয়া পতপত-নিনাদে পাঠকসমাজের চূড়ার উপর উড্ডীয়মান হইব। কিন্তু তখন লেখকজাতিকে চিনি নাই। চাণক্য যদি সম্পাদক হইতেন, তবে তাঁহার বিখ্যাত শ্লোকের মধ্যে "রাজকুলেষু"-শব্দের পূর্ব্বে "লেখকেষু" বসাইয়া দিতেন। এই লেখকদের সম্বন্ধে ভাবী ও বর্ত্তমান সম্পাদকগণকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমার এই কাহিনীর

অবতারণা। এই লেখাটি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক-মহাশয় স্বজাতিহিতৈষিতার পরিচয় দিবেন।

সবে-মাত্র কালেজ ছাড়িয়াছি, তখন দেহ-ভরা উদ্যম, বুক-ভরা আশা, হৃদয়-ভরা স্বদেশপ্রেম! তখন অর্থানুরাগ অপেক্ষা বিদ্যানুরাগ প্রবল, বিদ্যানুরাগ অপেক্ষা যশোলিপ্সা প্রখরতর। আমার স্বদেশপ্রেম, বিদ্যানুরাগ ও যশোলিপ্সা, এই "ত্র্যহস্পর্শে"র সংমিশ্রণে অচিরেই এক বাংলা মাসিক-পত্রিকার জন্ম হইল। তার নাম রাখিলাম—"উদ্দীপনা।" ভবিষ্যতে আদরের পুত্রের অনশন ঘটিবার সম্ভাবনা দাঁড়াইলেও, যেমন জনক-বিশেষে পুত্রের অন্নাশনে অত্যধিক ব্যয় করেন, আমিও তেমনি উদ্দীপনার অনুষ্ঠানে অকাতরে—অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্থব্যয় করিলাম। আশাতীত আশা পাইলাম! বরষায় দর্দুরের মন যেমন নাচিয়া উঠে, ভরসায় এ ক্ষুদ্রের মনও তেমনি নাচিয়া উঠিল। আরও মাসিকপত্র যে না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু আমি বড় বড় লেখকের পৃষ্ঠপোষিত—

"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

আমার কাগজ চলিতে আরম্ভ করিল, বিজ্ঞাপনের দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে, প্রশংসাপত্রের ভেরীনিনাদ

করিতে করিতে, আমার কাগজ হুহু চলিতে লাগিল। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন দিনে দিনে বাড়ে, আমার সোণার-চাঁদ গ্রাহকও তেম্নি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু [illegible] মধ্যে অধিকাংশ কলাই যে পশ্চাদ্দেয় মূল্যের গ্রাহক, সে কথা স্বীকার করিতে হইবে। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে—কিন্তু এত কলঙ্ক থাকিলে চাঁদনীর অংশ অত্যন্ত কম পড়ে—আমার ভাগ্যে তাই ঘটিল—রজতচ্ছটা বড় সামান্য। সম্পাদক-চকোরের পেট যে ভরে না। কিন্তু তাতে কি? আমার যে মূল উদ্দেশ্য পাঠকসংগ্রহ, তা ত সিদ্ধ হইল। বিশেষত আমার স্বদেশানুরাগে কোন স্বার্থের গন্ধ ছিল না। প্রতিদানের আশা রাখিলে প্রেম গাঢ় হয় না, তাও আমার তখন জানা ছিল। তখন জানিতাম, ঘরের খাইয়া বনের মহিষ যদি তাড়াইতে না পারিলাম, তবে ধিক্ আমার স্বদেশপ্রেমব্রতে! কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, শতধিক্ ওই রজতচক্রখণ্ডে! সে পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বিভাগে বাড়ে না।

"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"

বিদ্যার মত এ উদারতাও তার নাই। দুইটি বৎসর অতীত হইতে না হইতে—

আমার পূর্ণ বাকস
শূন্য করিয়া
রুণি ঝুনি ঝুনি
গেল সে চলিয়া ।

ওগো—
এবে সে নিঠুর
দেখে না ফিরিয়া ॥

আমি—
কত তারে সাধি
দিবানিশি কাঁদি
চোখে বহে যায় দরিয়া ।

তবু—
সে তো রে আসে না ফিরিয়া ॥

বিপন্ন হইয়া গ্রাহকমহাশয়দের শরণাপন্ন হইলাম। বোধ হয়, অর্থ অনর্থের মূল ভাবিয়াই অনেকে আর্থিক কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেহ কেহ যাহা উত্তর দিলেন, তাহার ভাবার্থ—

ধন দিয়ে মন যদি সেই সে তুষিতে হ'লো ।
বাংলা মাসিক প'ড়ে তবে কিবা ফল বলো ॥

আমার নামজাদা লেখকগণও এইসময় আমার প্রতি একটু বেশি অনুগ্রহ আরম্ভ করিলেন। যিনি বড় দার্শনিক বলিয়া খ্যাত, তিনি লিখিতে লাগিলেন,—কবিতা; সমালোচক 'রহস্যে' ব্রতী হইলেন; কবি ধরিলেন,—রাজনীতি; ঔপন্যাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদের আসন লইলেন; আর ঐতিহাসিক মন দিলেন,—"কঠোপনিষদে!"

এই সকল প্রবন্ধ কাগজে বাহির হওয়ার পর লেখার প্রকৃত রস আস্বাদ করিতে না পারিয়া, সমালোচকগণ কাঁঠালের আমসত্ত্ব বলিয়া এগুলিকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দু-দশ কথা শুনাইতে ছাড়িলেন না। এ শ্রেণীর প্রবন্ধের সকলগুলি আমি না ছাপিয়া চাপিয়া রাখিতাম, অবশ্য এগুলি যে প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেছি, তাঁহা লেখকদের তখন বলিতাম না,

কিন্তু,—

"এ সকল রহে না গোপনে
বন্ধুকর্ণে প্রবেশিলে
প্রকাশ পায় তা জনে জনে।"

যাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়, তিনিই

চটিতে আরম্ভ করেন, প্রবন্ধ ফেরত চাহেন। একদিন সহসা দেখিলাম, আমারি কাগজে একখানি মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন মহাধুমধামে বাহির হইয়াছে। আমার অধিকাংশ লেখকই সে কাগজের লেখকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তখন আমার মনের ভাব যে কি-প্রকার হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীদাসের রাধিকার ভাষায় বলিতে গেলে—

"সই কেমনে ধরিব হিয়া!
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া!
সে বঁধু লেখক, না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে!
যাহার লাগিয়া, বাছাই তেজিনু
লোকে অপযশ কয়,—
সেই গুণনিধি, আমারে ছাড়িয়া
আর জানি কার্ হয়!
সম্পাদক হ'য়ে লেখক ভাঙায়ে
এমতি করিল কে?

আমার পরাণ, যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে।"

অনেক লেখক আবার এরূপ কোন কারণ না ঘটিতেই নূতনে মন দিলেন! হায় এই সব লেখকদের নিকট আমরা সম্পাদকগণ বুঝি হবিষ্যের মালসা *— "নিতুই নব"। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কাগজ বাহির করিবার সময় আমায় বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন—এখন ইঁহাদের সে আশ্বাসবাণী কোথায় রহিল?

"যে মনেতে নাচাইলে
সে মন এখন রইল কোথা?
ডুমুরের ফুল হলি কি রে
দেখা পাওয়া কঠিন কথা।"

বুঝি—

"সে কাল গেল বৈয়া বঁধু
সে কাল গেল বৈয়া।"

একদিন এই শ্রেণীর একজন লেখককে পথে দেখিতে

* ইহাতে যেন এ কথা কেহ না বুঝেন যে, এই সকল লেখক জননীস্বরূপা বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ নিত্য করিয়া থাকেন।

পাইলাম। তিনি তখন আর-এক সম্পাদকের আফিসে প্রবেশ করিতে উদ্যত, নব সম্পাদকমহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে। আমি সবিনয় নমস্কার-নিবেদন করিলাম—"ভাল ত?—আর যে দেখা পাই না।" মুখে এইটুকু বলিলাম, কিন্তু আমার কাতর-দৃষ্টিতে প্রকাশ করিতেছিল,—

"এই পথে নিতি, কর গতায়তি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
নব-সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু আজ না ছাড়িয়া দিব।"

লেখক-মহাশয় ব্যাপারটা বুঝিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, যেন পলাইতে পারিলে বাঁচেন! ভাবটা,—

"চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে,
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে।"

"আচ্ছা, দেখা হবে" বলিয়া তিনি পাশ কাটাইলেন, আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম,—

"লেখক চপলজাতি
কোথা নাহি থির রয়।

যে তারে অধিক তোষে
তারে সে লেখা জোগায়!”

তা যে কারণেই হোক্, দিনদিন আমার বাঁধা লেখক-গণের মধ্যে অনেকেরই অনুগ্রহে বঞ্চিত হইতে লাগিলাম। আমার সময় খারাপ পড়িয়াছিল,—জানি না, একদিন কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল—

“ভাঙিনু মঙ্গলঘট আপনার হাতে!”

উদ্দীপনা-সম্পাদনে যিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন, তাঁহার কোন একটা লেখায় ব্যক্তিগত আক্রমণের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, একটু বাদসাদ দিয়াছিলাম। আরে বাপরে!—

“কে দিলে আগুনে হাত
কে ধরিল ফণী!”

সত্যই তখন আমার উদ্দীপনার—

“পঞ্চমে মঙ্গল আর রন্ধ্রগত শনি!”

তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি,—সাহস থাকে, সহ্যগুণ থাকে, পরমায়ু থাকে, “ভিম্‌রুলের চাকে” হাত দিও, কিন্তু লেখক বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে, অন্তত কোন নামজাদা মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদের দুই-

একটা লেখাও বাহির হইয়াছে, সম্পাদক হইয়া তাঁহাদের লেখায় হাত দিও না, দিও না, দিও না! তাহা হইলে তাঁহাদের রোষ রাবণের শক্তিশেলের মত তোমার বুকে বিঁধিবে, ইন্দ্রের বজ্রের মত তোমার মাথায় পড়িবে, বিষ্ণুর সুদর্শনের মত তোমার শক্তি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিবে। কিন্তু বলিতেছিলাম, এতদিনে আমি আপনার পায়ে আপনি কুঠার বসাইলাম। যাঁহার লেখায় আমার "উদ্দীপনা" উদ্দীপিত হইতেছিল, তাঁহারি ক্রোধে এখন বুঝি "উদ্দীপনা" দগ্ধ হয়। বুঝিলাম, আলো যে দেয়, পোড়াইতেও সেই পারে, কিন্তু—

"এতদিন বুঝি নাই, এখন কি হবে বুঝে!"

এখন যে,—

"আপন করমদোষে
সুধার সমুদ্র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াসে পরাণ শোষে।"

বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, আমার সেই লেখকচূড়ামণি অন্য কাগজে প্রবন্ধ দিতে লাগিলেন। এতদিনে—

"হা শম্ভু, তুমিও বাম!"

তা যাই হোক্, আমি তাঁহার আশা ত্যাগ করিলাম না,

অনেক সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি, হাঁটাহাঁটি করিলাম, কিন্তু আমার লেখকপ্রবরের একই কথা,—

"'যাও যাও মিছে সেধ' না,
ভাঙিলে সকলি মিলে
মন মিলে না!"

না মিলুক, আমি কিন্তু একদিন "না-ছোড়-বান্দা" হইয়া ধরিলাম।—

"আমার কি অপরাধ, তাই আর আমার কাগজে লেখেন না!"

উত্তর।—মনে করিয়া দেখ!

আমি।—তাহার জন্য কতবার ক্ষমা চাহিয়াছি, এক অপরাধের কি মার্জ্জনা হয় না?

উত্তর।—এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। এখন তুমি প্রবীণ সম্পাদক।

আমি।—তা নয়, এবার আমি কি স্থির করিয়াছি, শুনুন। আপনার অভিপ্রায় অনুসারেই এখন সমস্ত প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইবে,—উদ্দীপনা আপনারই।

উত্তর।—এখন আর সে কথা সাজে না। আমার উদ্দীপনা হইলে কি এমনতর ঘটে! তোমায় আমায় কি

সম্বন্ধ!—আমি তোমায় প্রবন্ধ দিব, তুমি ছাপিবে। আমার লেখা বাদ দিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া ছাপিবে, ইহা আমি সহ্য করিব, এ সম্বন্ধ নহে।

আমি।—উদ্দীপনা আপনার আশ্রিত—প্রতিপালিত, আপনার প্রবন্ধের ভিখারী! আমায় ক্ষমা করুন,—আমি অবোধ, না বুঝিয়া কি করিয়াছি,—আমায় ক্ষমা করুন।

তথাপি তিনি নিরুত্তর। আমি আবার বলিলাম, "কি বলেন?"

উত্তর।—আমি তোমার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিব।

বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন।

এবার বড় কষ্ট হইল, চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতেছিল, হুকুমে চক্ষের জল ফিরাইলাম; সবিনয়ে, অবিকম্পিত কণ্ঠে, বলিতে লাগিলাম, "তবে যাও, পার, লিখিও না। বিনা-পরাধে আমায় ত্যাগ করিতে হয়, কর, কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে! মনে রাখিও, একদিন তুমি খুঁজিবে, কোন্ সম্পাদক আমার মত ভাল-মন্দ-নির্ব্বিচারে তোমার সকল প্রবন্ধ ছাপে!

দেবতা সাক্ষী, যদি তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকে, তবে তুমি আবার লিখিবে, আমি সেই আশায় কাগজ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, আর লিখিব না,—কিন্তু আমি বলিতেছি, আবার আসিবে—আবার লিখিবে। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি উদ্দীপনারই, অন্য মাসিকের নও।” এই বলিয়া আমি ভক্তিভাবে তাঁকে নমস্কার করিয়া ফিরিলাম। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যুক্তকরে মনে মনে উর্দ্ধমুখে অথচ অস্ফুটবাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম—“কেহ আমাকে বলিয়া দাও, আমার কি দোষে এই সাতাইশ-বৎসর-মাত্র বয়সে, এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল! আমার অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে, আমায় লেখকেরা ত্যাগ করিল, আমার সাতাইশ-বৎসর-মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে “উদ্দীপনা” ভিন্ন আর কিছু ভালবাসি নাই, লেখকের মনোরঞ্জনব্রত ভিন্ন ইহ-লোকে আর কিছু করি নাই, করিতে শিখি নাই, তবু—আমি আজ নিরাশ হইলাম কেন?”

কাঁদিয়া-কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, দেবতা নিতান্ত নিষ্ঠুর, যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন লেখক বা গ্রাহক,

আর কি করিবে! ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষ কাগজ উঠাইয়া দিলাম, সম্পাদকজন্ম হইতে খালাস পাইলাম!

কিন্তু—

"এখনও এখনও কেন—।"

বুড়া বয়সের কথা।

বুড়া বয়সে কপালগুণে যে ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিল, তোমরা তাহাকে অল্পে ছাড় না। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" শ্লোকার্দ্ধ অবলম্বন করিয়া কেহ নিন্দা কর, কেহ বিদ্রূপ কর, কেহ বা রাগও কর, আরও যে কিছু না কর, তা-ও বলিতে পারি না! তা' তোমরা রাগ করিতে পার,—যাহা যুবারই প্রাপ্য, তাহা বুড়া হইয়া আমরা লইয়াছি, সুতরাং তুমি যুবা, তুমি রাগ করিতে পার! কিন্তু শুধু রাগ করিলেও বাঁচিতাম।

আমরা বেশ সুখে আছি, কিন্তু আমাদের দুঃখ ভাবিয়া, তোমরা পাঁচজন পাড়াপড়শী, তোমাদের চোখে যে ঘুম নাই, ওই ত জ্বালা! আর তোমরা যে বিদ্রূপের চাপা হাসি হাসিয়া কথায় কথায় আমাদিগকে "পিটি" করিতে

এস, সেটাও কিছু অসহ্য। তাই আজ এ বয়সের গোটা-কত কথা তোমাদিগকে শুনাইব। দেখিও, বুড়ার মুখ শুনিয়া যেন ভাবান্তর না হয়।

প্রথম কথা—তোমরা বল, বুড়া বয়সে নবীনার পাণি-গ্রহণ করিলে বিবাহের যে প্রধান উদ্দেশ্য "একীকরণ", তাহা সাধিত হয় না। সে কেবল জলে "তৈলীকরণ" হয়, সুতরাং অমিলেই জীবন কাটিয়া যায়, দুঃখেরও অবধি থাকে না। আমরা কিন্তু এ কথা মানি না। তোমাদের এ কথার উত্তরে ভক্ত রামপ্রসাদের মত এই-মাত্র বলিতে চাই :—

একীকরণে কিবা ফল,
জলেতে মিশায় জল
চিনি হওয়া ভাল নয় ভাই, চিনি খেতে ভালবাসি।

এখন বুঝিয়া দেখ, তোমাদের "একীকরণ" অপেক্ষা আমাদের এ "তৈলীকরণ" ভাল কি না?

দ্বিতীয় কথা—তোমরা বলিতে চাও, প্রকৃত ভালবাসা আমাদের অজ্ঞাত; কেন না, তোমাদের বিশ্বাস, ভাল-বাসাটা তোমরা যুবক-যুবতীর দল একচেটিয়া করিয়া বসিয়া আছ। আমার কথা শুনিয়া তোমরা হাসিবে, তা

হাস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমরাই ভালবাসিতে জান না। হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, এই তাঁর বিশ্বাস; কিন্তু সেই মৃণালিনীর নামে একটু কলঙ্ক শুনিয়া, সত্য কি মিথ্যা বিচার না করিয়াই, অমনি হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে, এমন কি, তার প্রাণনাশ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবার দেখ, তোমাদের আদর্শ-প্রেমিকা সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রনাথকে কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত দেখিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া একেবারে কাশীতে উপস্থিত। কিন্তু এমন কেহ দেখিয়াছ কি যে, কোন যুবকের প্রতি নবীনার অনুরাগলক্ষণ প্রবল দেখিয়া আমাদের মধ্যে কেহ কাশীবাসী হইয়াছে? এরূপ স্থলে আমাদের পক্ষে—

"কাজ কি আমার কাশী
ওই পদ-কোকনদ তীর্থ রাশিরাশি।"

কিন্তু আমাদের এ ভালবাসা কেহ বড়-একটা "এপ্রি-সিয়েট্" করিতে পারিল না। বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্তও এইরূপ চঞ্চলমতি যুবক-যুবতীর ভালবাসা দেখাইতেই ব্যস্ত, কিন্তু বেচারা বুড়াদের এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাঁহারও নভেলে বড়-একটা স্থান পাইল না। আমরা যে কেবল ভালবাসি,

তাই নয়, প্রতিদানের আশাও বড়-একটা রাখি না। কিন্তু তোমাদের ভালবাসা অনেকটা প্রতিদানের আশায়।

"তুমি ভাল বাসিবে ব'লে ভালবাসি নে" এ কথা আমরাই বলিতে পারি। এই মহান্ ভাবে তোমাদের অধিকার নাই।

ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে তোমরা অধীর হইয়া উঠ, তখন তোমরা অনেকে মনের দুঃখে গাও—

"ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসে না।"

কিন্তু এরূপ স্থলে আমরা কি করি, আমরা বলি—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসরমত বাসিয়ো!

* * * *

তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির- বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো!

শুনিতে পাই, রচয়িতা গানটি কোন যুবতীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি—

যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।

ইহা কোন যুবক-যুবতী প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারে না। এ সব কথা আমাদের মত বুড়ারাই বলিতে পারে। সঙ্গীত-রচয়িতা আমাদের মত বুড়া কি না, জানি না, কিন্তু গানটি কোন যুবকের অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে, এ বিশ্বাস সহজে হয় না—কেন না, এত-বড় উদারভাবের কথা কেবল আমাদেরই মুখে শোভা পায়। আর এক কথা, যেমন-তেমন প্রতিদানেই তোমরা সুখী নও, প্রতিদানটা আঠার-আনা হওয়া চাই, নহিলে তোমাদের খুঁৎখুঁতুনি যায় না। তোমরা যুবক-যুবতী কেহই সহজে পরস্পরের নিকট খাট হইতে চাহ না। উভয়েই আশা কর, পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিবেই; আবার যে-সে ভালবাসাতেও তোমাদের মন ওঠে না। তোমাদের নভেলী ভালবাসা চাই। কিন্তু তেমনটি ত সংসারে ঠিক মিলে না। যেমন ভালবাসাই হউক, সংসার করিতে গেলে ভালবাসার পাণ হইতে এক-আধ-দিন চূণ খসিবেই খসিবে। এদিকে কিন্তু এই সামান্যতেই তোমাদের সুখ নষ্ট করে, আর আমাদের?—আমরা জানি, আমরা আমাদের গৃহিণীর

উপযুক্ত নহি। আর আরও জানি, গৃহিণীর চক্ষে আমাদের সম্বন্ধ কেবল দানের,—অলঙ্কারের কি ভালবাসার ঠিক জানি না;—কিন্তু এটা জানি, আমরা প্রতিদানের আশা করিতে পারি না, তাই বড়-একটা করিও না। মনের এই অবস্থায় গৃহিণী যদি একদিন, যে কারণেই হোক্, হাসিয়া দুটা কথা ক'ন, কিংবা বাহিরে যাইবার সময় প্রফুল্লমুখে একটা পাণ হাতে দেন, তবে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাই। তখন ভালবাসার এই অপূর্ব্ব প্রতিদান পাইয়া শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, আনন্দের অবধি থাকে না। এখন বুঝিয়া দেখ, সুখী কে? তোমরা, না আমরা?

সুখদুঃখের কথা ছাড়িয়া তোমরা আর-এক দিক্ হইতে আমাদিগকে একটু বেশী গালিগালাজ কর। আমরা বুড়া বয়সে কালাপেড়ে কাপড় পরি, ভাল সাজসজ্জা করি, পড়া দাঁত বাঁধাই, পাকাচুলে কলপ দিই—এই সব লইয়া তোমরা তামাসার বড় বাড়াবাড়ি কর। এই-সে-দিন একটি যুবক আমাদের চুলের কলপ লইয়া আমাদিগকে কি না বলিলেন! তিনি প্রমাণ করিতে চান আমরা প্রবঞ্চক, নীচ ইত্যাদি। কেন বাপু, আমাদের অপরাধটা কি? আমরা বুড়া বয়সে যুবার সাজ

সাজি, তা' কাচ কাচিবার জন্য নহে—গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্য। আমরা যাহা করি, তাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই করি; যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে সুখী করাই আমাদের উদ্দেশ্য। গ্যালান্‌ট্রির দল হইতেও শুনিতে পাই, যুবতী ভার্য্যা যে অঙ্গরাগ—যে বেশভূষা করেন, তা' কেবল স্বামীর আনন্দবর্দ্ধনের জন্য; তবে আমাদের বেলা সেটি না হয় কেন? চুলের কলপে যদি আমাদেরই দোষ হয়, তবে অলঙ্কার-ঝলকে যুবতীর দোষ না স্পর্শিবে কেন? তাহাতে ত কেহ কিছু বল না? সাধে কি দুঃখ করিয়া বলি—

কে না যায় যমুনায় কে না যায় মথুরায়
মাথে লয়ে দধির পাশরা।
তোমার ও চন্দ্রবদন কে না করে নিরীক্ষণ
সবে ভাল কলঙ্কী আমরা॥

তবে একটা কথা তোমাদের বলিবার আছে। নবীনার পাণিগ্রহণ করিয়া আমরা না হয় সুখী হইলাম, কিন্তু নবীনার কি সুখ? বুড়া স্বামী হইলেই যে স্ত্রী সুখী হইতে পারিবে না, এমন কোন ধরাবাঁধা আইন নাই। সতী, উমা, ইঁহারাও ত বুড়া স্বামীর হাতে পড়িয়াছিলেন,

কিন্তু তাঁহাদের মত সুখী স্ত্রী কয়টা দেখাইতে পার? তাঁহাদেরও মাঝে মাঝে কলহ-কাঁদাকাটি না হইত, এমন নয়, কিন্তু সেটা দাম্পত্যকলহ। তেমন কলহ—তেমন অজাযুদ্ধ আমাদেরও হয়, বরং কিছু বাড়াবাড়িও হইয়া পড়ে—কিন্তু তাতে কত সুখ!

"অভিমান ছলছল মুছাতে নয়নজল,
লাগে কত সুখ,
তোমরা ত ভাই বুঝ্‌লে না কো
রয়ে গেল দুখ।"

তোমরা অবশ্য জান, বৈচিত্র্যই জগতে আনন্দের মূল। যেখানে বৈচিত্র্য নাই, সেখানে উপভোগে দিনে দিনে অবসাদ বা বিরক্তি অবশ্যম্ভাবী। তোমরা কি কখন প্রণয়িনীর রূপের বৈচিত্র্য দেখিতে পাও? কিন্তু আমরা দিবানিশি বুড়া শিবের মত এক গৃহিণীতেই দশমহাবিদ্যা দেখিতে পাই। সে ষোড়শী মূর্ত্তি কখন কালী, কখন তারা, কদাচিৎ ভুবনেশ্বরী, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধূমাবতী।

আজও দেখিতে পাই, কুমারীরা বিবাহের জন্য সেই

বুড়া শিবেরই পূজা করে; কিন্তু বিবাহের জন্য তোমাদের মত কার্ত্তিকের পূজা কেহ করে না! এখন ভাবিয়া দেখ, সুখী কে? তোমরা, না আমরা? আজিকার মত আমার কথাটি এইখানেই ফুরাইল।—

বুড়া বয়সের কথা অমৃতসমান
মন দিয়া যুবা ভাই কর অবধান।

ইতি। কস্যচিৎ বৃদ্ধস্য।

ব্যারিষ্টার।

সেই সে দিন, যে দিন দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া সুদূর-ইংলণ্ড-প্রবাসী হইয়াছিলাম, সে দিনের কথা মনে পড়ে! বৃদ্ধা মাতার শোকোচ্ছ্বাস, যুবতী পত্নীর হাহুতাশ, আত্মীয়-বন্ধুর দীর্ঘশ্বাস,. সকলই মনে পড়ে! সেই অকূল অর্ণববক্ষে পোত-পক্ষিণীর তাণ্ডবনৃত্যে, ক্ষুদ্র আরোহী আমি, যখন চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, যখন বালিকা নববধূর মত আলয়ে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন প্রত্যাবর্ত্তনের আর উপায় নাই বুঝিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম, সে কথা মনে পড়ে! সে যেন, সে দিনের কথা! সেই আমি চলিলাম, পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া, জননীর সঞ্চিত ধন গোপনে আত্মসাৎ করিয়া, পত্নীর

অলঙ্কার কৌশলে লইয়া, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পর সংসার মায়া-বিমুক্ত আমি চলিলাম,—দ্বাপরে বেণুমুগ্ধ ধেনু যমুনা-সন্তরণে কৃষ্ণদরশন-আশে মথুরায় ছুটিয়া ছিল, ত্রেতায় ভক্তিমুগ্ধ পবননন্দন সীতা-উদ্ধার-মানসে লঙ্কায় ছুটিয়াছিল, আর কলিতে সাতসমুদ্র-তেরনদী পার হইয়া, ব্যারিষ্টারি-পাসে মায়ামুগ্ধ আমি ইংলণ্ডে ছুটিলাম।

ব্যারিষ্টারি—আমার চিরসাধ! কৈশোরে কোন আত্মীয় উকীলের সহিত মাঝে মাঝে হাইকোর্টে গিয়া ব্যারিষ্টারের সম্মান ও অর্থলাভে বিস্মিত হইতাম, আর ভাবিতাম,—

বনার্জী পালিত তা'রা-ও বাঙালী
ঘোষ বসু রায় কত আর বলি
সিংহ চৌধুরী বার্-এট্-ল সকলি
রুদ্র কি শুধুই ঘুমায়ে র'বে?

না,—

ব্যারিষ্টারি ব্যারিষ্টারি ব্যারিষ্টারি সার
ব্যারিষ্টারি-চিন্তা বিনা কিছু নাহি আর!

তাই আমি তখন হইতেই কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির সহিত সম্পর্ক ঘুচাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইংরাজী চাল-চলন, ধাঁজ-ধরণ সমস্তই অভ্যাস করিতে লাগিলাম

প্রতিভা কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না। কুম্ভীর-শিশু বিনা শিক্ষায় সন্তরণপটু হয়, বানরশাবক জন্মগ্রহণ করিয়াই বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিতে শিখে, আর আমিও একলব্যের মত বিনা উপদেশেই সাহেবি কায়দায় এতটা পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম যে, স্বয়ং মিষ্টার 'ব' পর্য্যন্ত প্রথমে অবাক্ হইয়াছিলেন। শেষে বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে আত্মসংবরণ করিয়া [illegible],—"রাধামাধব ইঙ্গিতে-ইঙ্গিতে গাঁঠে-গাঁঠে সাহেব। একেবারে বুটের ডগা হইতে হ্যাটের আগা পর্য্যন্ত বিলাতী।" পরিশেষে যখন আমার গলার স্বর বাঁকিয়া পড়িল, জিহ্বায় আড় ধরিল, 'পূর্ণিয়া' বলিতে 'প্যর্ণিয়া' এবং 'আনন্দরাম' বলিতে 'অনোণ্ডোরম' বাহির হইতে লাগিল, তখন তিনি বুঝিলেন আমার আর চিকিৎসা নাই—বুঝিলেন, কখন্ একসময় তাঁহারই ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচ লাগিয়া এই বাঙালীর কৃশকৃষ্ণ দেহে উদগ্র সাহেবিয়ানা একেবারে আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গোটা-গোটা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে! ক্রমে বিকার যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন সমুদ্রের এপারে আর টিঁকিতে দিল না—ভূমধ্যসাগরে পাড়ি লাগাইলাম।

তিন-বৎসর পরে যখন ফিরিলাম, তখন আমাকে যে

কেহ চিনিতে পারিবে, এমন আশাও করি নাই—ইচ্ছাও হয় নাই।

কিন্তু তটস্থ হইবার পূর্ব্বেই দেখি, আমার অবোধ বাল্যকালের মহাভ্রম; আমার শৈশবের গুটিকয়েক বন্ধু অৰ্দ্ধনগ্ন অসভ্যতার ভূলুণ্ঠিত জয়পতাকাস্বরূপ ধুতির কোঁচা দোলাইয়া জাহাজে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। এদিকে তখন আমার জাহাজের নূতন বন্ধুরা এই সকল অনাবৃতগুল্‌ফ জীবদিগের গতিবিধি সকৌতুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আমি যে ইহাদেরই সহিত প্রাণিবৃত্তান্তের একপর্য্যায়গত, কেবল আমার ধুতির কোঁচাটা ভিতরের দিকে তিরোহিত হইয়া কপিকরণ-ব্যাপারে অদৃশ্য মানসিক লাঙ্গুলে পরিণত হইয়াছে, সে কথাটা প্রকাশ হওয়া আমার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। আমার পুরাতন বন্ধুরা প্রিয়সম্মিলনে অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন—সুতরাং জাহাজ হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়া ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর ছিল না।

পিস্‌তুত ভায়া বলিলেন, "হোটেল পরে হইবে, আগে একবার মার সঙ্গে দেখা করিয়া এসো।" আমি মনে মনে

বলিলাম, "তা সে প্রস্তাব ভাল, দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মকাল হইতে মার কাছে ত ধরা পড়িয়া আছিই, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের সঙ্গে গিয়া আমি হোটেলের খানসামাদের কাছে মান খোয়াইতে পারিব না। অতএব চল বাড়ীতেই।"

হায়, যেখানে গেলাম, তাহাকে ঘর বলিতে পার, বাড়ী বলিতে পার, কিন্তু তাহা home নহে। যাহাকে বলে উত্তপ্ত আদর, সেটি সেখানে পাইবার জো নাই। মা ত হাসিয়া-কাঁদিয়া অস্থির; আর, দেয়ালের আশেপাশে দরজার আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে যে একটি জড়সড় কম্পমান উপচ্ছায়ার মত দেখা যায়, তাহাকে পরিবার বলিতে পার, সংসার বলিতে পার, বউ বলিতে পার, কিন্তু সে কি সেই সুন্দর সংক্ষিপ্ত সুমিষ্ট শব্দের বাচ্য—যাহাকে বলে wife, সে কি মিসেস্ রুডর্! তাহার নাম লজ্জাবতী দাসী, কিন্তু সে কি লিজি?

তাহার পরে বাম হাতে ভর দিয়া পাশে দুই পা ছড়াইয়া আসনে বসিয়া যে বিপরীত কাণ্ডটা করা গেল, তাহাকে ভক্ষণ, ভোজন, খাদন, গিলন, যাহা খুসি বলিতে পার, কিন্তু তাহা কি taking meals? তবু যাই খানকয়েক খয়রামাছ ভাজা ছিল!

প্রথম-প্রথম কলিকাতায় সুবিধামত বাড়ী খুঁজিয়া পাই নাই, কাজেই কয়েকদিন হোটেলে থাকিতে হইয়াছিল। পরে পার্কষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করা গেল! মা ত, আমার কলিকাতা পৌঁছিবার পরেই, কি ভাবিয়া জানি না, কাশিবাসিনী হইয়াছেন! কাজেই তোমাদের হিন্দু আমলের আমার সেই বাল্যবিবাহের পত্নী-রূপ কর্ম্মফলটি একা আমারই হস্তে রহিয়া গেল! কর্ম্মটি বাপ-মায়ের রোপিত, মুক্তিও তাঁহারা পাইলেন, ফলটি কেবল আমার! এ ফল যদিচ জ্ঞানবৃক্ষের ফল নহে, শিশুকালের অজ্ঞানবৃক্ষেরই ফল, তবু দেখিতেছি, তাহা হইতে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু তোমরা শুনিয়া খুসী হইবে, বছর-দুই না যাইতেই আমার এই রঙ্গভূমি হইতে যবনিকা উদ্ঘাটন করিলাম, আমার স্ত্রীর মুখের ঘোমটা ঘুচিল, এবং দোকানে ঘোরা হইতে টেনিস্-খেলা পর্য্যন্ত সভ্যসমাজের সমস্ত নাট্যাভিনয় সবেগে সুরু হইল, মাঝে মাঝে হাততালি পড়িল, কিন্তু তখন পঞ্চমাঙ্কের কথাটা কিছুই ভাবি নাই।

এদিকে যখন আমার স্ত্রীর ক্ষীণাঙ্গে হ্যারিসন্ হ্যাথাবের দোকান হইতে নব নব ফ্যাশান্ বিজাতীয় দম্ভ সহকারে

কোথাও বা অসঙ্গতরূপে স্ফীত, কোথাও বা অপর্য্যাপ্তভাবে লুণ্ঠিত, কোথাও বা নির্দ্দয়ভাবে পিনদ্ধ, কোথাও বা নিরর্থকভাবে বহুলীকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন ঢাকা-বেনারস-মুর্শিদাবাদ পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইবার বাসনা করিল। শীতগ্রীষ্মনির্ব্বিচারে আমার স্ত্রীর কমলকরে যখন নকল হাতির দাঁতের পাখা ললিত ভঙ্গী সহকারে দোদুল্যমান হইয়া উঠিল, তখন সূর্য্যোদয়ে শশিকলার মত শাঁখার আর দেখা পাওয়া গেল না। আবার যখন তাঁহার দক্ষিণ মণিবন্ধে নবসভ্যতার রাখিবন্ধনস্বরূপ বিপুল-প্রশস্ত বিলাতী ব্রেস্‌লেট্ চড়িল ও তাঁহার বামহস্ত "কনক-বলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ" হইয়া প্রাচ্যশ্রীকে বিদায় করিয়া দিল, তখন আমি ইংরাজী করিয়া বলিলাম, "প্রেয়সি, তুমি আমারই!" প্রেয়সীও সেই ভাষায় উত্তর করিলেন, "রাধামাধব, তুমি একটি নির্ব্বোধ হংসী!" হংসীকে ইংরাজীতে নির্ব্বোধ বলে, কিন্তু আমার স্ত্রী যদি বাংলা করিয়া গর্দ্দভ বলিতেন, তাহা হইলে সোহাগটা তেমন প্রকাশ পাইত না বটে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি সত্যটা যেন আর একটু পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

এদিকে আমি বার্-লাইব্রেরির নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে

একদিন পূর্ণপরিণত ধূমকেতুর মত পুচ্ছবিস্তার করিয়া প্রবেশ করিলাম। সে দিন আমার কি আনন্দের দিন! বাসরগৃহের সুখস্মৃতির মত, সে স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। যে গৃহে উড্‌রফ্, ইভান্স, জ্যাক্‌সন্, পল্, বাঁড়ুযো, পালিত, ঘোষ, ইন্দ্রের সভায় দেবতার মত বিরাজ করিতেছেন, আমিও আজ সেই সভার "সভ্য"রূপে আসনপরিগ্রহ করিলাম—একদিন যে আমি এ সভার সভাপতি না হইব, এমন কথা কে বলিতে পারে? আমার মনে সে আশা ছিল কি না, বলিব না; কিন্তু আমার সহযোগিগণের সে-প্রকার আশঙ্কা যে জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝিয়াছিলাম—কেন না, বোধ হইল যেন আমার পদার্পণে উড্‌রফের মুণ্ডিতশ্মশ্রুগুম্ফ ঘষা পয়সার মত মুখখানি ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল, ইভান্সের বিশীর্ণ বদনপঙ্কজ আরও শুকাইয়া গেল, দীর্ঘনিশ্বাসে বাঁড়ুয্যের যোজনব্যাপী শ্মশ্রু বাত্যাতাড়িত কদলীপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল, ঘোষের কমলচক্ষু ছলছল হইল, পালিতের কৃষ্ণবদনেও কালিমা স্পর্শ করিল, রায়ের ক্ষীণদেহ যেন লীন হইবার উপক্রম হইল। আরও মনে হইল, পলের খর্ব্বাকৃতি যেন খর্ব্বতর এবং জ্যাক্‌সনের মার্জ্জারলাঞ্ছিত গুম্ফবীথিকা

নমিত হইয়া পড়িল। আমার পক্ষে অবশ্য এ সব শুভ লক্ষণ—তাই আশায়-ভরসায় দিন কাটাইতে লাগিলাম।

আশায় আশায় দিন যায়। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস গেল, ক্রমে বৎসরও অতীত হইতে চলিল, আশা তখন আশঙ্কায় দাঁড়াইল। কারণ, দেখিলাম বাংলাদেশের মক্কেলমণ্ডলী আমার বিরুদ্ধে যেন ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া আছে। আমাদের এই অনৈক্যপ্রধান দেশে এমন অটল ঐক্য আর কিছুতে দেখা যায় না।

যে বাবুটিকে পাইয়াছিলাম, আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে সেটি কিছু অতিরিক্ত চতুর। অনেক টাউটের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে পুলিস্-কোর্টে বা আলিপুরে, ক্বচিৎ—বড় মনে পড়ে না—হাই-কোর্টে দুই-একটা কেস্ পাওয়া যাইত! কিন্তু দুই-মোহর, অসমর্থ পক্ষে—ওর-নাম-কি, সময়ে সকলের পক্ষেই—এক-মোহর বন্দোবস্তেও রাজী হই; অবশ্য ভাগের বেলা আধা-আধি, কিন্তু তাও যেন,—

"গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়!"

কি করি বল, দালালদিগকে ত আর চটান যায় না। যথালাভ, বিস্তারিত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—

"বুঝে দেখ যে জান সন্ধান।"

বিনা পয়সায় দরিদ্রের মোকদ্দমা চালাইব স্থির করিলাম, কিন্তু সে পথেও কাঁটা,—আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র্ ব্যারিষ্টারও এ-প্রকার নিঃস্বার্থ উপকারে রত।

আমার অবস্থা ত এই, এদিকে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-বৃক্ষটি, আমার লিজি, ক্রমশই দ্রুতবেগে ফলবান্ হইয়া উঠিতে লাগিলেন—আমার সন্তানগণ মক্কেলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিল না; তাহারা, না চাহিতেই, একটির পর একটি নিয়মিত দেখা দিতে লাগিল। ইহাকেই বলে অযাচিত অনুগ্রহ।

ঋণও আমার সন্তানদের পথানুসরণ করিল। আমার পক্ষে একটিমাত্র পন্থা অবশিষ্ট রহিল—সে কেবল মহাজনের পশ্চাতে। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

'বিলেত' থেকে যখন প্রথম ফিরি, তখন এ দেশটা যে এত গরম, তা বুঝি নাই; এখন স্পষ্ট দেখিতেছি, র‍্যান্‌কিনের বাড়ীর কাপড়চোপড়গুলা আমাদের সয় না; উহা অপেক্ষা চাঁদ্‌নী অনেকটা ঠাণ্ডা। তা ছাড়া, সাহেবি-খানা অপেক্ষা ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যে আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা

স্বাস্থ্যকর, এক্‌স্পীরিয়ন্স্‌ আমায় তা শিখাইয়াছে। কিন্তু আমার স্ত্রীটিকে শিখাইবে কে? নিজেই সে ভার লইলাম।

হিন্দু রমণী রন্ধনে—শুধু রন্ধনেই কিন্তু—দ্রৌপদী, সহিষ্ণুতায় সীতা, বিপদে দময়ন্তী, গৃহকার্য্যে গোবরার মা অথবা বঙ্কিমবাবুর প্রফুল্লমুখী, এইপ্রকার দৃষ্টান্তমূলক অজস্র উপদেশ দিতে লাগিলাম। হিন্দু স্ত্রী কি কেবল সম্বন্ধে সহধর্ম্মিণী, সে সেবায় দাসী, আহারে বায়ুভুক্‌, কার্য্যে বিশ্বকর্ম্মা, বেশে দিগম্বরী,—ক্রোধে নহে—এইরূপ কত শাস্ত্রবচন শুনাইলাম, কিন্তু আমার সে ধর্ম্মের কাহিনী কে শুনে। আমিই যে "নাটের গুরু"; আরও নাকি আমার—

"ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন";

সুতরাং গৃহিণীর গৃহস্থালীর এষ্টাব্লিশ্‌মেণ্ট্‌ আর কমিল না।

মনে আছে যখন পুরাতন ঝিকে বিদায় দিয়া ১৬৲ টাকা বেতনে মাদ্রাজি আয়া রাখিয়াছিলাম, তখন শোকে এবং ঘৃণায় মিসেস্‌ রুদ্রের স্নান-পান-আহার বন্ধ হইয়া দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিয়াছিল—এক্ষণে যখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইলাম, আয়ার পরিবর্ত্তে ঝির খোঁজ করিতে

লাগিলাম, তখন ও কি!—দেখি আমার গৃহে আবার ঠিক তেমনই বিদ্রোহ উপস্থিত, কিন্তু সেদিন আর "কাঁদিয়া-ভিজায়-মাটি"-রকমের করুণাময়ী মূর্ত্তি নহে, সে মূর্ত্তি রুদ্রাণীরই উপযুক্ত, উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি! কাজেই পিছু হটিয়া আমি বেহারাটার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলাম, গৃহিণী কিন্তু তাহার বিরুদ্ধেও প্রচুর যুক্তি প্রয়োগ করিলেন। বলিলেন, "ড্রয়িংরুম ঝাড়্‌পোঁছ্‌ করিবে কে?" ড্রয়িংরুম-ব্যাপারটি সামান্য নহে; তাহার দেয়ালে জাপানী পাখা, আয়না, ছবি, কাঁচের বাসন, পিন্‌বেঁধানো প্রজাপতি, তাহার কোণে, তাহার ভিত্তিগাত্রে টেবিল্‌, হোয়াট্‌নট্‌, ক্যাবিনেট্‌, ছিটের কাপড় ও রেশমের টুক্‌রা-খচিত বেতের বিচিত্র চৌকি ও সোফা, পুঁতুল, ফুলদানী, ঘড়ি, আর কাঁচের, মাটির, পাথরের, কাঠের, চিনামাটির, কাগজের, কাপড়ের যতপ্রকার অসঙ্গত অনাবশ্যক পদার্থ ফ্রান্স-জর্ম্মণি-ইংলণ্ডের কল্পনায় আসিতে পারে, তাহা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া আছে। বলিলাম, "এগুলো বিক্রি করিয়া ফেলি।" গৃহিণী বলিলেন, "লোক ডাকিয়া বসাইবে কোথায়?" আমি কহিলাম, "প্রথমত না ডাকিলেই চলিবে, দ্বিতীয়ত জঞ্জালগুলা গেলে বসাইবার জায়গা আরও

বাড়িয়া উঠিবে।” শুনিয়া রুদ্রাণী আবার সেই রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন, আমিও ক্ষান্ত দিলাম। পূর্ব্ববৎ বাবর্চ্চি রাঁধিতে থাকে, খান্‌সামা টেবিল সাজাইয়া যায়, বেহারা অভ্যাগতের কার্ড লইয়া আসে, গাড়ি তৈরি হইলে স্ত্রী আমাকে বার্-লাইব্রেরিতে পৌঁছাইয়া হ্যারিসন্ হাথাবের বাড়ী জামার মাপ দিতে যান, চার টেবিলে টেনিস্‌বেশীদের সমাগম হয়, ডিনার্-টেবিলে কাঁচের পাত্রে কাঁটা-ছুরি ঘনঘন ঝঙ্কার দেয় এবং ঈভ্‌নিং পার্টিতে গৃহকোণ হইতে একখানি পুরাতন পিয়ানো সুরে-বেসুরে লয়ে-বেলয়ে বাজিয়া উঠে।

কিন্তু আস্‌বাব্‌পত্র যত বেশী, দৈন্যরাক্ষসীকে ঢাকিয়া রাখাও তত শক্ত। আস্ত জিনিষ ভাঙে, সেটের জিনিষ হারাইয়া যায়, নূতন জিনিষ পুরাতন হয়, রেশমের টুক্‌রার রং জ্বলিয়া আসে, ছিটের ভাঁজে ভাঁজে ধূলা জমিয়া উঠে, সোফার গদি দাবিয়া যায়, চৌকির পায়া নড়্‌নড়্ করে, পর্দ্দার চিকণের কাজ ছিন্নপ্রায় হয়—দারিদ্র্য বাহ্য ঐশ্বর্য্যের প্রত্যেক ছিদ্র—প্রত্যেক ব্যবচ্ছেদের ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া পরিহাস করিতে থাকে। ক্রমে অবস্থার দায়ে নূতন যাহা কেনা যায়, তাহা খেলো

হয়, কারণ তাহা বার্ণিশ্-করা পলস্তা-লাগান সেকেণ্ড্‌হ্যাণ্ড, তাহা নিলামের আবর্জ্জনা—একটার সঙ্গে আর একটার মিল হয় না, এ দিক্ ঢাকিতে ও দিক্ বাহির হইয়া পড়ে—ভুশ্চেষ্টার সহিত অসামর্থ্যের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব লোকসমাজের কাছে নানামতে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠে।

কিন্তু যে সমাজে পড়িয়াছি, সেখানে অগ্রসর হওয়া কঠিন, ফিরিবার পথও নাই। কাজেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া রোগা-কালো ছেলেগুলোকে কলার্-টাই-ফ্রকে ফিরিঙ্গী সাজাইয়া ঘাগরা-পরা আয়ার হাতে বদ্ হিন্দি শিখিতে দিলাম, তাহাদের ভবিষ্যতের মাথা খাইয়া রাখিলাম এবং আমারও বর্ত্তমানের বড় সুব্যবস্থা হইল না।

দেশে কিঞ্চিৎ জমিদারী এবং কলিকাতায় দুইখানি বাড়ীও ছিল। বিলাত যাইবার সময় সমস্ত সম্পত্তিই বন্ধক দিয়া যাই, বাড়ী দুইখানি দুইজন স্বনামখ্যাত এটর্ণির জিম্মায় ছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা আমায় আকাশের চাঁদ হাতে দিবার ভরসা দিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় এরূপ আশা পাইয়াছিলাম যে, আমি ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলে, তাঁহাদের প্রদত্ত মোকদ্দমার ফী হইতেই দুই-এক বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ হইয়া

যাইবে এবং আমার বাড়ী আমারই থাকিবে। তাঁহাদের হাতে মোকদ্দমার অভাব নাই, কিন্তু এখন আর তাঁহারা আমার দিকে ফিরিয়া চাহেন না, অন্যকে ব্রিফ্ দেন! তখন অভিমানে ফুলিয়া-উঠিয়া মনে মনে করি—

কই কই বাবু, না আসে মক্কেল
মরমে রহল ব্যথা,
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া
ভাঙিব আপন মাথা।
এ ব্রিফের ব্যাগ্, এই বাস্কেট্
বৃথা শোভে ইনি শিলে, *
সব হৈল মিছে, আর কেন বাবু
ভাসাও গঙ্গার জলে।
হাভানা সিগর, আইস্ বা টি
লাগিছে গরল হেন,
ছার সে গাউন, এ কলার্-ফণী
দংশিছে হৃদয়ে যেন!

আরও ভাবি—

কেন কৈনু ব্যারিষ্টারি সাধ
সাধের অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ!

প্রথম-প্রথম আমার টিফিনের বড় ধুমধাম ছিল, তেমন টিফিন বার্-লাইব্রেরির অতি কম মেম্বারই করিতেন। ক্রমে যখন দেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, যখন স্বদেশের হিতের জন্য ইংরাজীতে স্পীচ্ দিতে এবং স্বদেশী ভাষার উন্নতিকল্পে ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন টিফিনটা দেশী ভাবে—যথা মটরসুঁটি, মুড়ি, খাঁটি আখের গুড় ইত্যাদি—আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কুলোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল দেখিয়া, সেটাও তুলিয়া দিয়াছি। এক্ষণে কেবলই বার্-লাইব্রেরির বরফজল ও গরম চা খাই, উচ্চৈঃস্বরে boyকে তলব করি এবং বদান্যতালব্ধ চুরোট ফুঁকিয়া দাবাবোড়ে চালি।

জেলা-কোর্টের ভাব দেখিয়াছি, কলিকাতায় বরং "ঋণং কৃত্বা" চলে, কিন্তু মফস্বলে তারও উপায় নাই।

এখন আমার দশা,—

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে !

তাই বলি,

সকল হারায়ে ব্যারিষ্টার হ'লে
তেমতি ঘটিবে তারে ।

দাদার কাণ্ড।

সংসারের একমাত্র অবলম্বন, জীবনের একমাত্র সহায় যে স্নেহময়ী জননী, তাঁহার শোকে প্রথমত বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে তাহাও সহিল। আমরা দুই ভাই; দাদা বড়, আমি ছোট। * মার স্বর্গারোহণের সময়, আমার বয়স বার, দাদার উনিশ। ছেলেবেলাতেই দাদার বিবাহ হয়। বধূঠাকুরাণী তাঁর অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট। এই পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকাই তখন আমাদের গৃহের গৃহিণী। কিন্তু সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূঠাকুরাণীর গুণের কথা আর কি বলিব? তাঁহার স্নেহে, তাঁহার যত্নে, আমার শৈশবের সকল অভাবেরই মোচন হইয়াছিল। আমি তখন বড় আদুরে ছিলাম,—আমার সকল বায়না, সকল আব্দার রক্ষা করা বড় সহজ ছিল না। মা-ও সময়ে সময়ে বিরক্ত

হইয়া উঠিতেন। কিন্তু বৌমা আমার হাসিমুখে সকল দৌরাত্ম্যই সহিতেন। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি,—সম্ভবত মার দেখাদেখি বধূঠাকুরাণীকে ছেলেবেলা হইতেই আমি "বৌমা" বলিতাম।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দাদা সতের-বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাস্ করেন। কষ্টে কিছুদিন এল্-এও পড়িয়াছিলেন। মার হাতে সামান্য কিছু টাকা ছিল, তাহা হইতেই কোন রকমে সংসার চলিত। মার শ্রাদ্ধাদি 'যেন তেন প্রকারেণ' সম্পন্ন করিলেও,আমাদের পুঁজিপাটার অবশিষ্ট যা, সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। কাজেই, দাদাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের গ্রামের নিকটেই এক মাইনর স্কুল ছিল, দাদা তার হেড্মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। বেতন নামে পঁচিশ, রসিদেও পঁচিশ-টাকা লিখিয়া দিতে হইত, কিন্তু দাদা পাইতেন নগদ উনিশ-টাকা মাত্র। আর ছয়-টাকা নাকি স্কুলের মাসিক চাঁদা। আমিও সেই স্কুলে পড়ি। মার কোলের ছেলে, বড় আদরের, পড়াশুনায় প্রথম-প্রথম তেমন চাড় ছিল না। বলিতে লজ্জা করে, সেই বারবৎসরের ধেড়ে ছেলে আমি, তখনও মাইনর স্কুলের পঞ্চম

শ্রেণীর উপর উঠিতে পারি নাই। পড়াশুনায় মন নাই, সারাদিন খেলা আর খেলা! এ দিকে সেই অল্প বয়সেই দাদাকে ঘোর সংসারী হইতে হইয়াছিল। দাদা চিরদিন ধীর, স্থির, বিনয়ী, অথচ বুদ্ধিমান্। লোকে বলে, বুদ্ধিটা না কি আমারও ছিল, সেটা কিন্তু বেশী খেলিত দুষ্টামিতে। পাড়ার সকল ছেলে, স্কুলের সকল সমপাঠী,—কথাটি নিতান্ত অবিশ্বাস করিও না,—স্বয়ং পণ্ডিতমহাশয়ও আমায় কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। পণ্ডিতমহাশয়কে না হউক, তাঁর বেত-গাছটিকে ভয় না করে, এমন ছেলে দুনিয়ায় দুর্লভ। আমি ছিলাম কিন্তু সেই দুর্লভ রত্নের একটি। পণ্ডিত-মহাশয়ের বেত অন্য ছেলের নিকট ভ্রষ্টশিকার সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় ভীষণ আস্ফালন করিত, আর আমার বেলায় তার দশা হইত যেন প্রহৃত কুক্কুরের ল্যাজটি। পড়াশুনা করিতাম না, তবু আমার প্রতি পণ্ডিতমহাশয়ের যে এতটা অনুগ্রহ, বলিতে হইবে কি, সে কেবল আমার নষ্টবুদ্ধির জোরে? সে বুদ্ধির পরিচয়টা আর এ বয়সে দিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ গুরুনিন্দা, সেটা আর নাই করিলাম। কিন্তু কি বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, বার-বৎসর বয়সেও আমার লেখাপড়া কিছুই হয় নাই। মার মৃত্যুর

পরে দাদা আমায় একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "বিনু"—আমার নাম বিনয়, বাড়ীতে কিন্তু সকলে আদর করিয়া বলিত বিনু—"এখন ত একটু বড় হয়েছিস্, নিতান্ত অবুঝও ন'স্—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কি করে' চল্‌বে বল্? আমরা গরিবের ছেলে, মূর্খ হ'য়ে থাক্‌লে দু'মুঠা খাবার উপায় আমাদের নাই। এই দেখ্, যদি ভাল করে' লেখাপড়া শিখিতে পারিতাম, তবে কি আর সামান্য টাকার জন্য রোজ দুইক্রোশ মাটি হেঁটে এই গরু-ঠেঙান কাজ কর্ত্তে হতো, না সংসারেরও এই কষ্ট থাকৃতো? মা ত দুঃখ-কষ্ট সয়ে চলে গেলেন, আমরা কিন্তু এমনই হতভাগা যে, তাঁকে একদিনও সুখী কর্ত্তে পার্‌লেম না।" বলিতে বলিতে দাদার চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। পণ্ডিতের বেতের ভয়ে যে হৃদয় একদিনও কাঁপে নাই, প্রতিবেশী আত্মীয়ের গুরুগম্ভীর উপদেশেও যে মন বিচলিত হয় নাই, আজ সহসা সে পাষাণ গলিল। পরদিন হইতে মাষ্টার, পণ্ডিত এবং সতীর্থবৃন্দ, সকলের বিষম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, আমি ক্ল্যাসে প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। সে দুষ্টামিও তিরোহিত হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকৃতই একজন ভাল-ছেলে হইয়া দাঁড়াইলাম। ষোল-বৎসর

বয়সে প্রথম বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু বৃত্তি পাইলাম না।

পাসের সংবাদে দাদা, বৌমা, সকলেই মহাখুসী! কিন্তু শীঘ্রই সকলের সে হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল। মাইনর ত পাস্ করিলাম, কিন্তু তার পর? এখন ত এণ্ট্রেন্স পড়িতে হইবে। দাদা কৃষ্ণনগরে যে আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন, সে আত্মীয়টি ত বহুদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন, তবে উপায়! দাদা মোট পান উনিশ টাকা, জমিজারাং কিছু ছিল না, চারি-পাঁচটি পরিবার, সুতরাং তাহাতেই টানাটানি পড়ে। তবে আমার পড়াশুনার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে?

দাদা বড় বিষণ্ণ, তাঁর মুখ দেখিলেই মনে হয়, কি যেন একটা দারুণ মনঃকষ্টে তিনি সদাই বিষম ব্যথিত। সহসা দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। বৌমা একদিন বলিলেন, "এত ভাবনা কিসের? আমার যে গহনা আছে, ইহাতেই অন্তত পাঁচ-সাত-শত টাকা হইবে, সেই টাকায় কিছুদিন ত চলুক, তার পর ঈশ্বর একটা উপায় অবশ্যই করে' দিবেন।" আমি সেইখানেই ছিলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না না, তা কি হয়?" বৌমা

আমা[illegible]দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন বিনু?" সে কথার উত্তর আর আমার মুখে আসিল না। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতেই বৌমা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বুঝিয়া ভারি অপ্রতিভ হইলাম, কষ্টও হইল। বৌমার প্রস্তাবে দাদার বুক হইতে যেন একখানা পাষাণ নামিয়া গেল।

এখন কথা উঠিল, কোন্ পথে যাই? এন্‌ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িতে এখনও চারি বৎসর, আবার এন্‌ট্রেন্স পাস্ করিলেই যে চতুর্ভুজ হইব, এমনও কিছু নয়। তার পর এল্.এ., বি.এ., সে ঢের দিনের কথা! শেষ কলিকাতায় ক্যাম্বেল্-স্কুলে পড়াই স্থির হইল। দাদার আন্তরিক ইচ্ছা, আমি জেনারেল্ লাইনে যাই। বৌমারও বড় সাধ, আমি একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাদিগ্‌গজ হই। কিন্তু অবস্থা-বিবেচনায় এবং আত্মীয়-বন্ধুর পরামর্শে সে সাধে বাদ পড়িল।

আমাদের গ্রামের নবীন ও ভূপেন কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটিতে তাঁহারা বাটী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মেসে "সিট্"ও খালি ছিল; সুতরাং কলিকাতায় গিয়া প্রথম ও প্রধান যে উদ্বেগ, তাহা দূর হইল। নবীনদের

সহিত কলিকাতা যাওয়াই স্থির, শেষ যাত্রার দিন আসিল। আমার যাওয়ার ক্ষুদ্র আয়োজন প্রস্তুত। বৌমাই সব গুছাইয়া দিয়াছেন, একটি টিনের প্যাঁটরায় প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও একটি পুঁটুলিতে থানকতক আমসত্ব, পাকা আমের আমচুর, আর আমি সুপারি বড় ভালবাসি বলিয়া 'মিহি-সুপারি' সেরখানেক বাঁধিয়া দিলেন, আর দিলেন একটা ভাঁড়ে সের-তিনেক গাওয়া ঘি। সঙ্গে সঙ্গে বৌমা মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "শুনেছি কলিকাতায় ভাল দুধ-ঘি মেলে না; রোজ দু'বেলা ঘি অবশ্য অবশ্য খেও।" কলিকাতা গিয়াই ভাল জুতা-জামা কিনিয়া লইবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। তার পর স্বহস্তে আমের শাখা ভাঙিলেন, ঘট পূরিয়া আনিলেন। এখন আমায় যাত্রা করিতে হইবে। আমাদের বড় ঘরে এক-খানি আসন পাতা, বৌমা আমায় সেইখানে বসিতে বলিলেন; নিজেও আমার নিকটে বসিয়া আদ্যা শক্তি ভগবতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আমার মঙ্গলের জন্য ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া আমায় সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। শেষে আমার কপালে দধি ও সিন্দূরের

ফোঁটা ও মাথায় "নির্ম্মাল্য" দিলেন। আবার পরক্ষণেই নির্ম্মাল্যটি আমায় ভাল করিয়া চাদরের খোঁটে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন, শেষে "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা" বলিতে বলিতে আমায় লইয়া যাত্রার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

এদিকে ট্রেনের সময় যায়; ভূপেন ও নবীন পথে দাঁড়াইয়া; দাদা শীঘ্র রওনা হইবার জন্য আমায় তাড়া দিতে লাগিলেন; কিন্তু বৌমা সে সকল গ্রাহ্য করিলেন না,—কিছু না খেয়ে কি যাওয়া হয়? কাজেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। 'পাথেয়' লুচি-সন্দেশও বৌমা সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। আমি বৌমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, বৌমা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষু-দুটি জলে ভরিয়া আসিল! আমরা রওনা হইলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, বৌমা খিড়কিতে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিলেন।

ষ্টেশন্ আমাদের বাড়ী হইতে দেড়-মাইল। দাদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। যাহা যাহা বলিবার, দাদা তা আমায় পথেই বলিতে বলিতে চলিলেন। দাদার সে কয়টি অমূল্য উপদেশ আমি চিরজীবন হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম,

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও আসিল। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া আমরা গাড়িতে উঠিলাম। আমাকে নবীন ও ভূপেনের হাতে সঁপিয়া দিয়া দাদা বিষণ্ণহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। গাড়িও ছাড়িল, আর আমার বুকের ভিতরটা কেমন-যেন করিয়া উঠিল। সেই অবস্থায় কলিকাতায় পঁহুছিলাম। মন বড় উড়ু উড়ু। ক্রমে আলিপুরের বাগান, মিউজিয়ম্, কেল্লা, ইডেন্ গার্ডেন্, দেখিতে দেখিতে মনটা কতক বসিল। তখন ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়ায় খুব মন,—তিনটি বৎসর কোন্ দিক্ দিয়া কাটিয়া গেল, আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। পাসের সংবাদ লইয়াই বাড়ী গেলাম। বৌমার মুখে আর হাসি ধরে না। দাদারও চিন্তাক্লিষ্ট বদনে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা দিল। তখন প্রশ্ন উঠিল, চাকরি লওয়া কি ব্যবসা করা? আসাম-অঞ্চলে একটা পঁচাত্তর-টাকা বেতনের কাজ পাইবার আশা পাইয়াছিলাম। বৌমা ত তা শুনেই বল্লেন, "সর্ব্বনাশ, আসাম?—না ভাই, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না; ঘরের ছেলে, ঘরেই থাক।" সত্যই ঘরের ছেলে ঘরেই রহিলাম। দেশে তেমন ভাল ডাক্তার তখন কেহ ছিলেন না। সকলে দেশেই ডিস্পেন্সারি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তা

হ'লে ঔষধপত্র ও অন্যান্য আস্‌বাব্ সংগ্রহ করিতে প্রথমেই যে অন্তত দুই-শত টাকার দরকার। বৌমা এবারেও বিপদে কাণ্ডারী হইলেন। বলিলেন, "আমার এখনও যে গহনা আছে, তাহাতে আড়াই-শ তিন-শ অনায়াসে হবে।" বৌমার কথার উপর কে কথা কহিবে? আমি ঔষধপত্র আনিবার জন্য অলঙ্কার সহ কলিকাতায় রওনা হইলাম। বৌমার হাতে এখন শুধু দু'গাছি শাঁখা রহিল। যাইবার সময় দাদা খানকয়েক আইনের পুস্তকের ফর্‌মাইস্ দিলেন। বলিলেন, "একবার 'কমিটি'-পরীক্ষা দিতে হবে।" দাদা কিন্তু মতলবটি মন্দ ঠাওরান নাই।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ, ক্রমে ছ'মাসের মধ্যে আমার মাসিক আয় চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত হইল। পশারও বেশ্ জমিল। তবে দেশে যত পশার, পয়সা তেমন নহে। যা হোক, ভবিষ্যৎ বড় মন্দ মনে হইল না। যা কিছু পাই, সবই বৌমাকে আনিয়া দিই। মধ্যে একটা বড় দাঁও উপস্থিত হইল। দেশস্থ কোন ধনাঢ্য ও বদান্য জমিদারের স্ত্রী ও পুত্রকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া এককালে তিন-শত টাকা পুরস্কার পাইলাম। সে টাকাটা কিন্তু

আর বৌমাকে দিলাম না। গোপনে সে টাকার একটা সদ্গতি করিলাম। তখন সোণার বাজার সস্তা, সেই তিন-শত টাকাতেই বৌমার হাতের বালা, গলার হার ও কাণের মাকড়ি হইল। গহনা দেখে ত বৌমার ভারি রাগ। আমাকে "এ গিন্নিমি কর্‌তে কে বল্লে?" বৌমা কোথায় আমার সম্বন্ধের জোগাড় করিতেছেন, বিবাহে অন্তত ছয়-সাত-শত টাকার দরকার, আর আমি কি না,—বলা নাই, কহা নাই,—মাঝখান হ'তে এতগুলো টাকা নয়-ছয় করে' ব'সে আছি? বৌমা তখন ব্যবস্থা করিলেন, "আচ্ছা থাক্, এ হার-মাকড়ি সব কনের হবে।" এইবার আমার মুখ ফুটিল,—কোনদিন বৌমার সঙ্গে কথান্তর ঘটে নাই, আজ ঘটিল। সে ভারি কোঁদল। পাঠিকাগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হইবেন যে, সেই কলহে আমারই জয় হইল। শেষ বৌমাই সে অলঙ্কার ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলেন।

ক্রমে আমার আয় পঞ্চাশ-ষাইট টাকায় উঠিল। কোন মাসে বেশীও পাই। ষোল-মাস ব্যবসায় করিতে না করিতে শুনিলাম, বৌমা আমার বিবাহের সমস্ত স্থির করে' ফেলেছেন। বিবাহের আর দশদিন মাত্র বাকি।

অবাক্ কারখানা! বৌমাকে হাসিয়া বলিলাম,—"এটা কি সত্যি বৌমা?"

"কোন্‌টি বিনু-বাবু," বলিয়া বৌমাও হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

আমি। এই বিবাহের কথাটা?

বৌমা। তোমার মনে কি হয়?

আমি। আমার ত সম্ভব মনে হয় না।

বৌমা। অসম্ভবটা কিসে ভাব্‌লে?

* * * *

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। কনের চারি-শত টাকার গহনা-চেলি সমস্তই সংগৃহীত। এর উপর বিবাহের খরচ বলিয়াও বৌমার হাতে আড়াই-শত টাকা মজুত। আমার উপার্জ্জিত একটি পয়সাও বৌমা ব্যয় করেন নাই। কিন্তু আজ সে সমস্তই একেবারে অপব্যয় করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক, বৌমার নিকট মনে মনে হারি মানিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে বৌমাকে একটু খোঁটা দিতে ছাড়িলাম না। বলিলাম, "বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যে এ সংবাদটি জানিতে পারিনি, এ-ও ভাল।" বৌমা কথাটা বুঝিলেন। বলিলেন, "যা ভয় কচ্ছ, তা নয়;

কনে যেন গোলাপ-ফুলটি, আমি যে নিজে দেখে ঠিক করেছি বিনু-বাবু।"

"তা বেশ্, ফুলদানিতে রাখ্‌বেন" ব'লে আমি স্মিত-মুখে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। আরে রাম, সেখানে কি আর দাঁড়াতে আছে?

যথাসময়ে বৌমার সেই অপব্যয়ের ফলটি আমার হাতে উঠিল। বৌমা আমায় মাঝে মাঝে আদর করিয়া "দেবর লক্ষ্মণ" বলিতেন। আমিও তাই বৌমার প্রদত্ত ফলটি কিছুকাল লক্ষ্মণের 'ফল-ধরা-গোচ' ধরিয়া রহিলাম।

এবার আমার ব্যবসায়ের ভারি উন্নতি। ঘরে ঘরে জ্বর। লোকের সর্ব্বনাশ, আর আমরা ডাক্তার, কাজেই আমাদের পাথরে পাঁচ কিল। তিন মাসে আড়াই-শত টাকা ভিজিট্, এ ছাড়া ঔষধের দাম ত আছেই। সে-ও নিতান্ত অল্প নহে। দুধে জল মিশাইয়া জলের দামে দুর্নামের বিনিময়ে অনেক গোয়ালা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। ডাক্তারি-ব্যবসাতেও জলে উপার্জ্জন বড় কম নহে। সুতরাং সে হিসাবে ডাক্তারি-ব্যবসাটিকে Reformed গোয়ালার ব্যবসা বলা চলে। তবে এতে Municipal officerদের দন্তস্ফুট করিবার জো নাই, এই

যা বল। তা সে কথা যাক্, আমার আয়বৃদ্ধি দেখে বৌমা একদিন আমায় বলিলেন,—"দেখেচ বিনু-বাবু, কেমন পয়মন্ত বৌ এনেছি? যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

"লক্ষ্মীর বাহন বটে, আর পয়মন্ত নইলে কি আর গ্রামে ঘরে-ঘরে এত জ্বর-জ্বালা হয়!" বলিয়া আমি কার্য্যান্তরে গেলাম।

বিবাহের ছ'মাস অতীত হইতে না হইতেই বৌমা নববধূকে বাড়ীতে আনিলেন। এরই জন্য তিনি বুঝি বিবাহের সময় "ধুলা পায়ে নবসত" করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নববধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌমার কাজ বাড়িল। তার 'সাজগোজ' করা, চুল বাঁধা, খাওয়ান ইত্যাদিতে বৌমা আমার সদাই ব্যস্ত। বালিকা প্রথম-প্রথম দিন-কতক বাপের বাড়ীর জন্য খুঁৎখুঁৎ করিত। দুই-এক-দিন একটু-আধটু কান্নাকাটি করিয়াছিল, তার পর সব চুপচাপ।

একদিন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে, ভৃত্য শ্রীমান্ চৈতন্য আমার চৈতন্যসম্পাদন করিবার জন্য ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলাম, একটি 'কল্' আছে। কিন্তু এ ঘরের কলা-বৌটিকে একা রাখিয়া যাওয়া

চলে না, কাজেই বৌমাকে এ ঘরে থাকিবার জন্য ডাকিতে হইল। আমার প্রথম ডাকেই দাদা বলিলেন, "কে বিনু?" বলিয়া তিনি দোর খুলিয়া দিলেন। দাদা তখনও শয়ন করেন নাই, আইন-চর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আমাদের কথাবার্ত্তায় বৌমারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমাদের কাছে আসিলেন। আমি তখন দাদাকে বলিতেছিলাম, "প্রত্যহ এত রাত্রি জেগে পড়াশুনা কল্লে শরীর মাটি হয়ে যাবে যে।" "না" বলিয়া দাদা একটু হাসিলেন। বৌমা আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "আমিও রোজ ঐ কথা বলি; তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব করে' বলা হয়নি, এখন কিছুদিন ছুটি নিলেও ত চলে।" বৌমা ঠিক বলেছেন, আমি উদেযাগী হইয়া দাদাকে বিনাবেতনে তিনমাসের ছুটি লইতে বাধ্য করিলাম।

তিন-মাস-অন্তেই দাদা কমিটির পরীক্ষা দিলেন; ঈশ্বরেচ্ছায় পাস্‌ও হইলেন। সব্‌ডিভিসন্ আমাদের গ্রাম হইতে চারি-মাইল্‌ও নয়। সেইখানেই প্রথমে প্র্যাক্‌টিস্ করা স্থির হইল। কিন্তু দাদা আপাতত কিছুদিন চাকরি করার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভেখ নহিলে ভিখ মিলে না। ঘড়ি, চেন, পোষাক-পরিচ্ছদ ত চাই। আবার

কয়েকখানি আইনের পুস্তকও সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং কিছু টাকার দরকার। আমার কিন্তু এ যুক্তি ভাল বোধ হইল না। শুভস্য শীঘ্রম্! আমি প্রস্তাব করিলাম, ধার-ধোর করে' কোনপ্রকারে টাকা সংগ্রহ করেও সত্বরেই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বৌমা অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত আমার প্রস্তাব 'সেকেণ্ড' করিলেন,—অধিকন্তু বলিলেন,—"ধারই বা কর্ত্তে যাবে কেন?"

আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তখনও প্রায় দেড়-শত টাকা জমা! দাদা আর বাক্যব্যয় করিলেন না। "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্", তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইল। বাসাখরচের জন্য পঁয়ত্রিশটি টাকা হাতে লইয়া দাদা যাত্রা করিলেন। Practice আরম্ভ হইল—দাদা আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন। তাঁহার জমাখরচে দেখিলাম, প্রথম মাসে উপার্জ্জন তের-টাকা আট-আনা; খরচ সাতাইশ-টাকা পাঁচ-আনা আড়াই-পয়সা! দ্বিতীয় মাসে বাসাখরচের জন্য 'পুঁজি' হইতে আড়াই-টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় মাসে খরচ বাদে ছয়-টাকা উদ্বৃত্ত হইল। পর মাসে আয় পঞ্চাশেরও বেশী। ক্রমে বৎসর

অতীত হইতে না হইতে দাদার খুব নাম ছুটিল! ফৌজদারি কোর্ট যেন তাঁর একচেটিয়া হইয়া উঠিল! যে কোন মোকদ্দমা হউক না, দাদা এক পক্ষে না এক পক্ষে আছেনই। ক্রমে মুনসেফি কোর্টেও দাদা 'কেস্' পাইতে লাগিলেন। বোধ হয়, দাদার তখন বৃহস্পতির দশা। মুন্সেফিতেও তাঁর বেশ্ পশার-প্রতিপত্তি দাঁড়াইল। দুই বৎসরের মধ্যেই দাদা সব্‌ডিভিসনের একজন প্রধান উকিল হইয়া উঠিলেন। মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট হইল। জেলার কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজা, জমিদার, বাঁধা-মক্কেল হইলেন। আমাদের সংসারের শ্রীও ফিরিতে লাগিল। পাকা বাড়ী, জোত, জমা, পুষ্করিণী, বাগান, একে একে সবই হইল। তখন বৌমা দুর্গোৎসবের সাধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষিত হইবার নহে। পূজা করা গেল। কিছু সমারোহও হইল।

দাদা কিন্তু তখনও নিঃসন্তান। সেজন্য দাদা বা বৌমা যে কিছুমাত্র দুঃখিত, এমনটি বুঝা যাইত না। তবে বাটীতে একটি কচি ছেলের অভাব কিছু-কিছু অনুভূত হইতে লাগিল। আত্মীয়-বন্ধু সকলে কার্ত্তিক-পূজার উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের কথার কুমার

কার্ত্তিকেরও শরণ লওয়া হইল। কুমারের অর্চ্চনাটা একেবারে বৃথায় গেল না। সংবৎসরের মধ্যেই বৌমার অপরিসীম একটা আনন্দের কারণ,—তাঁহার সাধের সে কনে-বউটির পঞ্চদশ-বৎসর বয়সে সন্তানসম্ভাবনা ঘটিল। মনের সাধে বৌমা "ভাজা সাধ" দিলেন; এবং যথাসময়ে, বৌমার ভাষায় "সাত রাজার ধন মাণিক"—"আঁধার ঘরের আলো"—একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বৌমার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? বৌমা আর আমাদের দিকে ভাল করিয়া চাহেন না। মেজাজ বড় গম্ভীর। ছেলের 'জেঠী'র কি আর ছেলে-মানুষী করিবার সময় আছে? মহাসমারোহে খোকার অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেল—বৌমা নিজেই ছেলের নামকরণ করিলেন—"হৃদয়-রঞ্জন!" বেশ্ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটিতে লাগিল। ষষ্ঠী দেবীও বিশেষ কৃপাবিতরণ আরম্ভ করিলেন! দুই বৎসরের মধ্যে আবার এক 'কন্যারত্ন' গৃহ উজ্জ্বল করিল।

সব্‌ডিভিসনে দাদার পশার-প্রতিপত্তি যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইল, তখন সকলে দাদাকে জেলা-কোর্টে যাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার সে বাঁধা-মক্কেল কয়েক-

ঘরও উৎসাহ দিতে ক্রটি করিলেন না। দাদা কিছুদিন ইতস্তত করিয়া জেলা-কোর্টেই গেলেন। গ্রহ অনুকূল,— জেলা-কোর্টেও সত্বর দাদার সুনাম রটিল! আয়ও দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সবই সুবিধা, অসুবিধা কেবল একটি, সব্‌ডিভিসনে থাকিতে দাদা প্রায়ই শনিবারে শনিবারে বাটী আসিতেন, এখন সেটি বন্ধ হইল। দুই মাস, তিন মাস, কখনও বা ছয় মাস অন্তর দাদার বাটী-আসা ঘটে। জেলা হইতে বড় বড় মোকদ্দমায় দাদাকে মাঝে মাঝে আমাদের সব্‌ডিভি-সনে আসিতে হইত। দাদা সেই সময় বেগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নান করিতেন, দুই-তিন দিনের জন্য বাটী আসি-তেন। এই এক অসুবিধা। আর বৌমা গেলে সংসার অচল, কাজেই দাদার সপরিবারে বাসায় থাকা ঘটিত না। ঈশ্বরকৃপায় ক্রমে দাদার আয়বৃদ্ধি এবং আমার বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশে এখন প্রায় ঘরে ঘরে ডাক্তার, সুতরাং আমার উপার্জ্জন দিনদিন কমিতে লাগিল। আমি ষষ্ঠীগাছ হইয়া 'ছেলে-পিলে' আগুলিয়া বাটীতে 'গেঁয়োমোড়ল' হইয়া রহিলাম। খরচপত্র সব দাদা পাঠান; আমি ঘুমাইয়া, তাস পিটিয়া ও

ছেলে কোলে করিয়া দিন কাটাই। দুটা-একটা 'কল্' কখনও পাই, কখনও বা না-ও পাই। কিন্তু তাতে সংসারের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পরিবারের সকলেরই হৃদয়ে অনাবিল শান্তি, মুখে নির্ম্মল হাসি, আর গৃহে বিপুল আনন্দ। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সহসা ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল! পূজার তিন-দিন অনবরত পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণ করিয়া বিজয়া দশমীর প্রত্যূষে বৌমার কলেরা দেখা দিল। প্রথম হইতেই লক্ষণ বড় মন্দ, তার উপর বৌমা গরমে অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া, কাহাকেও না জানাইয়াই প্রাতে স্নান করিয়াছিলেন। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আমি প্রাতেই সব্‌ডিভিসনের এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জন্‌কে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম। নিজেও প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু নিজের মাথার ঠিক ছিল না। মনে হইতে লাগিল, চিকিৎসা-শাস্ত্র বুঝি বা সব ভুলিয়া গিয়াছি। মধ্যাহ্নে এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জন্ পঁহুছিয়া আমার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। তখন নূতন উৎসাহে ডাক্তার-বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই

বাগ্ মানিল না। বৌমাকে বুঝি আর বাঁচাইতে পারিলাম না! বৌমা অন্তিমশয্যায় আমায় বলিলেন, “বিনু, আর কেন এত চেষ্টা ভাই? আমার যে সময় হয়েছে। আমার সব সাধই ত পূরেছে—আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি, এর চেয়ে আর আমার কি সুখ আছে?—আমি ত চলিলাম, ছোট-বৌ ছেলে-মানুষ, দেখো, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়!” তার পর বৌমা কাতরদৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিলে আমি কি-একটা উপলক্ষ্যে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। দাদার ডাকে, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরিলাম—দেখিলাম, দাদা চক্ষু মুছিতেছেন—বৌমারও চোখে জল। কই বৌমা! সব সাধ ত মেটে নাই? কিন্তু দেবি, তোমায় বাঁচাইতে পারিলাম কই? দাদার পায়ে মাথা রাখিয়া আমায় সম্মুখে বসাইয়া বৌমা আমার চক্ষু মুদিলেন, সে চক্ষু আর মেলিলেন না। আমাদের সোণার প্রদীপ নিভিয়া গেল, গৃহ অন্ধকার হইল। বিজয়ার প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহের সে, দেবীপ্রতিমাও বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম।

ছেলেদের কান্নায় গৃহে আর তিষ্ঠান যায় না।

"জেঠীমার কাছে যাব" বলিয়া তাহারা যে বায়না ধরে, তাহাদের গর্ভধারিণীও কিছুতে তাহা ভুলাইতে পারে না।

দাদার ব্যবহারে বাহিরের লোকে তাঁহার শোকের চিহ্ন-মাত্র ধরিতে পারিল না। অন্যে না বুঝুক, আমি কিন্তু বুঝিলাম, দাদা আমার "জ্বলন্ত শোকের আগুন" বুকে ধরিয়া গর্ভাগ্নি অচলের মত অচল হইয়া দিবারাত্রি পুড়িতে-ছেন। আহার করিতে করিতে দেখিতাম, দাদার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। একত্র শয়ন করিয়া দেখিতাম, দাদা রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বলিতেন, "রাণি! তুমি যে এমন, তা ত আগে জানিতাম না।" কোনদিন বা "এসেছ, চল যাই!" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসি-তেন। আমি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "কি দাদা!" "না কিছু নয়, স্বপ্ন দেখিলাম" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া দাদা আবার শুইয়া পড়িতেন।

বৌমার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইল। দাদা বৌমার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননের বন্দো-বস্ত করিয়া দিলেন। বৌমার নামে তাহার নাম হইল—"রাণীসাগর"।

দাদা এবার আদালত খুলিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই ব্যবসায়স্থানে যাইবার দিন স্থির করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম—"এ কয়টি দিন থাকিয়া গেলে হয় না?" দাদা একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, "সেখানে কাজকর্ম্মে তবু অনেকটা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিব।" আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

ক্রমে বৎসর অতীত হইতে চলিল। দাদা আর বাটী আসেন না; অবশ্য খরচপত্র বাটীতে রীতিমতই পাঠাইতেন। দাদা বাটী আসেন নাই বটে, কিন্তু দেশস্থ অনেক আত্মীয়-বন্ধু দাদার বাসায় পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে আমি দাদার নিকট যাইতাম; শুনিতাম, সমাগত আত্মীয়গণ দাদাকে পরামর্শ দিতেছেন, "এত অল্প বয়সে কি বিপত্নীক অবস্থায় থাকিতে আছে?" ইত্যাদি! তাঁহারা কেবল এই অমূল্য উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নিঃস্বার্থভাবে আপন আপন বয়স্থা কন্যা দান করিতেও প্রস্তুত। দাদা কিন্তু তাঁহাদের এ-হেন ত্যাগস্বীকারেও উপকৃত হইতে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। কেহ কেহ দাদাকে অনুরোধ করিবার

জন্য আমাকেও ধরিলেন ; কেহ বা এমনও জানাইলেন যে, দাদার ত বিবাহ করিতে ষোল-আনা মত, কেবল আমি কি মনে করিব, এই চক্ষুলজ্জাতেই দাদা বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। পূজার সময় দাদা বাটী আসিলেন। বোধ হয়, বৌমার অনুরোধ স্মরণ করিয়াই দাদা পূজা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু পূজা না পূজা। সে উৎসব ত শোকেই কাটিয়া গেল। আর-বৎসর এমনই দিনে হায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জগদম্বে! তোমার সহিত বৌমাকে যে একদিনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তুমি ফিরিলে, কিন্তু বৌমা কই ?

পূজা ত কোনরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু নিত্য নূতন কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়কুটুম্বগণের সমাগমে গৃহ আমাদের ভরপূর। দাদা সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। একদিন দেখি, বৌমার এক মেসো —ঠিক ধান-সম্বন্ধে নহে,—সপরিবারে আমাদের গৃহে উপস্থিত। মেসোটি নিতান্ত মাসিমা-রকমের! কিন্তু মাসিমা বড় জম্‌কাল লোক! কথায়-বার্ত্তায়, মৌখিক আলাপ-আপ্যায়িত প্রভৃতি রমণীসুলভ গুণে যেন মূর্ত্তি-মতী! আবার বিষয়বুদ্ধিতে রমণীমণ্ডলে দুর্লভ,—স্বয়ং

বৃহস্পতি আর কি ! মেসো-মহাশয়-রূপ নাবালকটির তিনিই নাকি 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্'।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই মাসিঠাকুরাণী বৌমার নাম ধরিয়া "রাণি, মা আমার, তোর এ সোণার রাজ্য ফেলে কোথা গেলিরে মা" ইত্যাদি করুণ ক্রন্দনে গৃহ অনুরণিত করিয়া তুলিলেন। তার পর দাদার আগমনে, বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল ; ক্রন্দনের সুর পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। "আমাদের কি একেবারেই ভুলে থাক্‌তে হয় রে বাবা, রাণী যে আমার 'মাসিমা মাসিমা' করেই পাগল ছিল রে বাবা!" ঠাকুরাণীর আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। উপস্থিত রোদনাবেগ কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। তার পর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া অঞ্চলে অশ্রুবিমোচনপূর্ব্বক শোকবিজড়িতকণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "বলি বাবা ত আমাদের পর করেছেন, আমরাই একবার খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। আর সৈরিন্দ্রিরও তোমাদের নামে লাল পড়ে, আহা রাণী আমার সৈরিন্দ্রিকে কত ভালই না বাস্‌ত। ভাল জামাটি, ভাল কাপড়খানি, সৈরিন্দ্রিকে না দিলে আর তার মন উঠ্‌ত না। আহা, অমন মেয়ে কি আর হয় ?" নির্ব্বাপিত বহ্নি বুঝি আবার প্রধূমিত হয়, কিন্তু না, এবার

সংক্ষেপেই পালা শেষ হইল। কিঞ্চিৎ আর্দ্রকণ্ঠে ঠাকুরাণী বলিলেন, "সৈরিন্দ্রি, কাঁদ্‌চিস্ বুঝি? কেঁদে আর কি করিবি মা! আয় এখন, তোর বোনাই-বাবুকে প্রণাম কর্‌বি আয়!" আমি সম্মুখের ঘরেই ছিলাম, দেখিলাম, রূপে আলো করিয়া মন্থরগমনে আসিয়া ব্রীড়াবনতমুখে এক কিশোরী দাদাকে প্রণাম করিলেন, এবং দাদা স্বাগতবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, ডাইন হাতের দুই অঙ্গুলিতে বাঁ হাতের মাঝের আঙুলের নথ খুঁটিতে খুঁটিতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন?" দাদা যেন একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, তুমি ভাল ছিলে!" সৈরিন্ধ্রী স্মিতমুখে "যেমন রেখেছেন" বলিয়া দাদার প্রতি একবার সলজ্জ আঁখি-দুটির কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আবার মুহূর্ত্তেই মাটির পানে মুখ নামাইলেন। দাদাকে একটু ইতস্তত করিতে দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী "বসুন্ না" বলিয়া সপ্ বিছাইয়া দিলেন। দাদা বসিলেন।

* * * *

মাসিঠাকুরাণী তখন আমার নিকট আসিয়া গল্প ফাঁদিলেন। এ কথা, সে কথা, বৌমার নানা গুণের

কথা তুলিয়া, শেষ দাদার বিবাহের কথা পাড়িলেন। আমাকে সেজন্য অনুরোধ করিতেও বলিলেন। আসল কথাটা কিন্তু তখনও ভাঙিলেন না। ঠাকুরাণীর ব্যবহারটি আমার আগাগোড়াই কেমন-কেমন মনে হইতেছিল; আমি কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারেই বলিলাম, "আপনারাই চেষ্টা করে দেখুন।" বলিয়া আমি বাহিরে গেলাম। কিন্তু ক্ষণপরে ফিরিয়া শয়নঘরে যাইতে যাইতে শুনিলাম, কক্ষান্তরে, কুটুম্ববাড়ী হইতে আগত ঝি বলিতেছে—"ভাল দেখেছ ঠাক্‌রুণ! তোমার যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই—তাই গিয়েছ কাজিকে শুধুতে দুগ্‌গোচ্ছবের পরবের কথা। আরে বিয়ে কল্লে ক্ষতিটা হবে কার? তখন কি আর এমন করে' পায়ের উপর পা দিয়ে দাদার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া চল্‌বে? না, দাদাকে বোকা বুঝিয়ে সর্ব্বস্ব লুটে নিতে পার্‌বে?" মাসিঠাকুরাণী বলিলেন, "নে বাপু চুপ কর্, ও সব কথায় তোর কাজ কি?" কথাটা ঝির পছন্দসই হইল না। সে সৈরিন্ধ্রীকে মধ্যস্থ মানিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তা আমি কি আর মিথ্যে বল্‌চি, কি বল গো সৈরিন্-দিদি?"

এখন আমাদের বাটীর যেটি গৃহিণী, সেটির ত সাত

চড়েও মুখে রা নাই; বোঝা বহিতে বেচারা বড় মজ্‌বুত্‌। কিন্তু হুকুম-তামিলে যেমন তৎপর, হুকুম চালাইবার ক্ষমতা তেমন নাই। তা হোক্‌, কিন্তু অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করিবার শিক্ষা সে বৌমার নিকট লাভ করিয়াছিল। এখন মাসিঠাকুরাণীদের যত্ন সে বেচারা প্রাণপণেই করিতে লাগিল।

প্রথম-প্রথম দুই-এক-দিন, দাদা মাসিঠাকুরাণীর কথা তুলিয়া আমায় বলিলেন, "ভাই, কি বিপদেই পড়েছি!" তার পর দাদার মুখে আর সেরূপ কোন কথা দুই দিন শুনিলাম না। দাদা যেন এখন সদাই কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক! যাহা হউক, নূতন কুটুম্বদের প্রতি দাদার আদর-যত্ন দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগে দাদাতে-আমাতে নির্জ্জনে বসিলেই, বৌমার কথা উঠিত। সে প্রসঙ্গে দাদা যেন থাকিতেন ভাল! কিন্তু আজ কয়দিন হইতে দাদা আর তেমন তন্ময় হইয়া এক স্থানে বসিতে পারেন না। আর বৌমার প্রসঙ্গও বড় উঠে না। দাদার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম—এখনকার মনের ভাবটিও যেন কতকটা না বুঝিলাম, তা নয়। কিন্তু দাদা আমায় এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুই-এক-দিন কি-যেন

বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। অন্য প্রসঙ্গ তুলিতেন, লজ্জায় আর আসল কথাটি বলা হইত না।

তবে দাদা ত আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক,—তিনি যাহাতে সুখী হন, সেই ত ভাল—তখন দাদার লজ্জার বাঁধ আমিই ভাঙিয়া দিলাম। একদিন বাটীর মধ্যে সকলের সমক্ষেই, দাদাকে বিবাহের কথা বলিলাম,—কথাটা তুলিতেই, সেই ঝি, মাসিঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া একটু আঁচাআঁচি করিল। ঠোঁট ফুলাইয়া একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চোখ মট্‌কাইল! দৈবক্রমে সেটাও আমার চক্ষে পড়িল। ঝির মনের ভাবটা—"উনি না বল্লেই যেন সব আট্‌কাচ্ছিল!" তা যেই আমার বিবাহের প্রস্তাব, আর অমনি দাদার সম্মতিপ্রকাশ আর কি? একবার যখন চক্ষুলজ্জা ঘুচিয়া গেল, তখন আর বাধা কিসের বল? দাদা আমার উদ্যোগী হইয়া অগ্রহায়ণের প্রথমেই সৈরিন্ধ্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের পর দশ-পনেরো দিন দাদা সস্ত্রীক বাটীতেই থাকিলেন। বড় বধূঠাকুরাণী, এই কয় দিনের মধ্যেই ঘর-সংসার বেশ চিনিয়া লইলেন। এই জন্যই বুঝি বলে—

"যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।"

দাদা আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যবসার স্থানে গেলেন। মাউই-ঠাকুরাণীও—ভূতপূর্ব্ব মাসীমহাশয়া—স্বামি-কন্যা সহ গৃহে গমন করিলেন। মাউই-মা যাইবার সময়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া যাইতে ভুলিলেন না।

দাদা এখন মাঝে মাঝে শ্বশুরবাটী যান। বিবাহের ছয়মাস অতীত হইয়া গেলে শুনিলাম, বড় বধূঠাকুরাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। বড় সুখের কথা। যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। দাদার পুত্র হইয়াছে, এর চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এই সন্তান যদি বৌমার, যাক্—সুখের দিনে সে দুঃখের কথায় আর কাজ কি?

বিবাহের পর প্রায় দুইবৎসর এইরূপ বিধিবিড়ম্বনায় বড় বধূকে পিত্রালয়ে থাকিতে হইল। তবে দাদা অবশ্য ২।১মাস-অন্তর শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। এ দুই বারের পূজার কয়দিন বাটী থাকিয়া, অবশিষ্ট ছুটিটাও দাদা শ্বশুরালয়ে কাটাইলেন। নব কুমারের অন্নপ্রাশন

উপলক্ষে বড় বধূঠাকুরাণীর আগমন হইল। দাদাও সে-সময় বাটী আসিলেন,আর দুই-চারি দিনের মধ্যেই মাউই-মা (দাদার এ পক্ষের শাশুড়ী), তাউই-মহাশয় (দাদার হালি শ্বশুর), তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গের, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝিরও আবির্ভাব হইল। বাড়ীখানি যেন হইল কাকসমাকুল বটবৃক্ষ। ছোটবধূ একা এতগুলি লোকের তত্ত্বাবধান করিতে হিম্‌সিম্ খাইয়া গেল। বড় বধূ ত এখন কুটুম্বমানুষ বলিলেও চলে,—তবে, এ চাই, ও চাই, ইত্যাদি ফর্‌মাইসে তিনি ঘরের লোকের মতই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই যা রক্ষা!

অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেলে, কুটুম্ব-কুটুম্বিনীগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাউই-মা যাইবার সময় আমার দু'খানি হাত ধরিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখো বাবা, তোমাদের বড় বৌ রইল, ছেলেমানুষ, ওর কোন দোষ-টোষ ধোরো না।" বাটীর মধ্যের ওদের কাছেও নাম ধরিয়া, "মা পিনু, (প্রিয়ম্বদার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, বৌমা-সম্পাদিত) তুমি বড়, সৈরিন ছোট, ছোট বোনের কোন অপরাধ নিও না," ইত্যাদি আপ্যায়িত-সুধা বর্ষণ করিয়াছিলেন।

মাউই-মা যাই বলুন, এবার বড় বধূঠাকুরাণী কিন্তু পাকা গৃহিণী হইয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত স্পষ্ট কথা না বলিলেও, 'জনান্তিকে' ফাইফর্‌মাইস্‌টা চলে, অর্থাৎ আমার সমক্ষে ছোট বধূকে উপলক্ষ্য করিয়া "দিদি, ঠাকুরপোকে বলো" ইত্যাদি।—কিন্তু যাহাকে বলিতে বলিতেন, তাহার কোন কথা বলার প্রয়োজন হইত না—আর বলিবেই বা কে? বড় বধূর সম্মুখে আমার সহিত কথা কওয়া দূরে থাক্, সে এক-গলা ঘোম্‌টা দিয়া জুজু-বুড়ীর মত এক পাশে দাঁড়াইত। বধূর ও সব বালাই ছিল না। তাঁহার একটি ছেলে হইয়াছে, অতএব ঘোম্‌টা মাথায় আশ্রয় পাইয়াছিল; ছোট বধূ এখন একটি পুত্র ও তিনটি কন্যার জননী, কিন্তু কেমন অবুঝ, এ পর্য্যন্ত ঘোম্‌টার পরিমাণ কিছুতেই সে কমাইল না। আমার উপদেশ, নজির, সব বৃথায় গেল—বেনা-বনে মুক্তা-ছড়ান আর কি?

তা সে কথা যাক্। বড় বধূ ক্রমে গিন্নিপনার গুরু-ভার হইতে ছোট বধূকে মুক্তি দিতে লাগিলেন। সে বেচারাও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাটীর যে ঝি ছিল, সে নীচজাতীয়া, সে বাসনকোসন মাজিত, উঠান

ঝাঁট দিত, ফাইফরমাইস্ খাটিত, সুতরাং ছোট বধূর এখন কেবল কাজ রহিল, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, ছেলে-দের খাওয়ান, জল আনা, বাটনা বাটা, রাখাল-কৃষাণদের ভাত দেওয়া, গৃহদেবতার সেবানুষ্ঠান করা, আর দুটি বেলায় কেবল চাট্টি রান্না আর পরিবেষণ, এইমাত্র। আর বড় বধূর হাতে ভাঁড়ার ঘর খোলা, দেওয়া, আবার তেলটুকু-নুনটুকু বের করা পর্য্যন্ত সব কাজ। যে ঝি আসিয়াছিল, সে কুটুম্ববাড়ীর লোক,—কাজেই সে শুধু খোকাকে লইয়াই থাকিত, আর মধ্যে-মিশেলে, বড় বধূর ভাণ্ডারগৃহের কার্য্যে সাহায্য করিত। বড় বধূ এখন রাঁধিবার চাল নিজে মাপিয়া দেন, পলা গুণিয়া ঘি দেন, আর এক-পোয়ার স্থানে পাঁচ-ছটাক তৈল লাগিলে, পাকশালের অধিকারিণী ছোট বধূর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। আমি শুনি, আর হাসি, আর ছোট বধূকে বলি, "এবার কেমন শক্ত গিন্নির পাল্লায় পড়েছ ?" সে বেচারিও হাসে। কিন্তু হায় !—

"আগে কে জানিত বল, হাসি হবে আঁখিজল,"—

বড় বধূর ব্যবহার ক্রমে কটু হইতে কটুতর হইতে লাগিল। ছোটবধূর আর না কাঁদিয়া দিন যায় না। সে

তবু নীরবে সকলই সহিত। তা, রামের বাণ না হয় সহা গেল, কিন্তু ঐ যে রামের অনুচর, তার কিচ্‌মিচি আর দন্তবিকাশন, সেটা নিতান্তই অসহ্য। ঝিও কি না মাঝে মাঝে ছোট বধূকে তিরস্কার করিতে সাহস পায়। আমি একদিন স্বকর্ণে শুনিলাম, ঝি ছোট বধূকে উপলক্ষ্য করিয়া তীব্রকণ্ঠে হাত নাড়িয়া বলিতেছে,—"রোজ রোজ বারণ করি, তা শোন না কেন? চাকরদের অত ভাল তরকারি দেবার কি দরকার? তোমাদের ত আর রোজগার কর্‌তে হয় না যে, দরদ লাগ্‌বে? সোয়ামীর কড়ি হতো ত বুঝ্‌তে পার্‌তে।" ছোট বধূ কিছু উত্তর দিল কি না, শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার আর সহ্য হইল না। ঝিকে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "ঝি, তুমি ঝি, ঝির মতই থাক্‌বে, ছোট মুখে বড় কথা কেন? মুখ সাম্‌লে চোলো।" আর কি রক্ষা আছে! ঝির উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও "তোমার সঙ্গে এসে আমার এত অপমান" ইত্যাদি বচনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বধূঠাকুরাণীর কণ্ঠও কাণে গেল—সে কণ্ঠ আজ সপ্তমে বাঁধা। বধূঠাকুরাণী বলিতেছেন, "ও মুখ সাম্‌লাতে যাবে কেন, ও কারু খায় না পরে? না কারু গলগ্রহ হয়ে আছে? যদি এতই মান, একটা কথা গায়ে না সয়, তবে

নিজে রোজগার করে’ আলাদা সংসার কল্লেই ত চুকে যায়। একটা ঝি আছে,—তা আর হিংসেয় বাঁচেন না,—কেন রে বাপু! আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, সাত জনার হাত-তোলায় পড়ে আছি,আমার সঙ্গে এত কেন? সাধ্যি থাকে, নিজের পয়সায় ঝি রেখে, যত ইচ্ছে অপমান কল্লেই ত হয়। আমার ঝিকে কিছু বল্লে ভাল হবে না কিন্তু।”

আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, রাগে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। সেই ক্রোধান্ধ অবস্থায় কি-যেন বলিতে যাইতেছিলাম, পিছু হইতে কে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল—“ছি! তুমিও কি পাগল হ’লে?” তাই ত ছোট বধূ ঠিক বলিয়াছে, বড় বধূর যে মেজাজ, তাতে আমি যদি সামান্য একটা কিছু বলি, তবে আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং সেদিন আমি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলাম না। ভাবিলাম, দাদা আগে আসুন, তার পর যা হয় করা যাবে। কিন্তু এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। দাদা ইহার ভিতর দুইবার বাড়ী এলেন; বলি বলি করিয়া, দাদাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল।

একদিন দাদা আর আমি বসিয়া গল্প করিতেছিলাম,

সহসা বড় বধূর কণ্ঠ, কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া মরমে পশিল। "বসে বসে কেবল শূয়োরের পাল বিওবেন, আর জ্ঞাতিবাদ সাধ্‌বেন!" বেশ বুঝা গেল, সে বাক্যবাণ ছোট বধূর উদ্দেশেই বিক্ষিপ্ত। কিন্তু দাদাও যেন সে স্বরশরে কিঞ্চিৎ আহত হইলেন। আমি কথাটি শুনিয়াছি কি না, সন্দেহে দাদা আমার দিকে চাহিলেন; আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া শেষ মুখ নত করিলেন। দাদা বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। "কি পাগ্‌লামি করে"—বলিয়া, উঠিয়া বড় বধূর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবার বড় বধূর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"কি অন্যায় কথাটাই বলেছি,—অত ভয় করে' থাকা আমার পোষাবে না। * * * তা আর চুপ চুপ কি? আমার কাছে এত ঢাক্‌ঢাক্-গুড়্‌গুড়্ নেই, আমার পষ্ট কথা। আমি অত অসইরন সইতে পারিনে। * * * কেন, আমি চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি। ওঁরা বসে বসে গেরস্থালিটা পয়মালে দেবেন, আর তাই বুঝি চুপ করে' দেখ্‌তে হবে? অত আহ্লাদ আমার কাছে খাট্‌বে না।"

এবার দাদার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দাদা কিছু রুক্ষ-স্বরে বলিলেন, "তোমার তাতে কি? তোমার অত

মাথাব্যথা কেন?” আর যাবে কোথা? বড় বধূর রোদনে ঘর ভরিয়া গেল। রোদনের সঙ্গে সঙ্গে শুনা গেল, “তা ত বটে, আমার মাথাব্যথা হবে কেন? যত ব্যথা ওঁর ভেয়ের আর ভাদ্রবোয়ের। তা থাক না কেন ভাদ্রবৌ আর ভাই নিয়ে; আমার বল্‌বার কি গরজ? আমাকে আজই বিদায় করে’ দাও। না দাও ত দিব্যি আছে।” দাদা উর্দ্ধফণ ফণীর মত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন রণে ভঙ্গ দিয়া ফিরিলেন যেন কেঁচোটি! দাদা আপন মনে বলিতে বলিতে এলেন—“কি আপদ্‌ই জুটিয়েছি।” দাদা যে-ক’দিন বাড়ী ছিলেন, তাঁর দিন বড় অশান্তিতেই কাটিল। বড় বধূ কিছুতেই বর্গ মানেন না। “হাত চেয়ে আম বড়, এ বড় প্রমাদ।” দাদা বাটী হইতে রওনা হইবার দিন আমায় কাতরভাবে বলিলেন, “ভাই! আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু এখন আর উপায় কি? মৃত্যু পর্য্যন্ত আমায় এই ভোগ ভুগ্‌তে হবে। আমার মুখ চেয়ে, সব সহ্য কর ভাইটি আমার! গায়ের ক্ষত, এ যে ফেল্‌বার নয় বিনু। আর, ও লোক নিতান্ত মন্দ নয়, তবে মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেলে পাগলের মত হয়ে যায়, এই বড় বিপদ্‌।” দাদার অবস্থা

বুঝিতে বড় বাকী ছিল না, আজ আরও বুঝিলাম। তাঁর জন্য বড় ব্যথিত হইলাম।

দাদা এবার প্রায় তিনমাস বাটী আসিলেন না।

পূজার পূর্ব্বে আর বাটী আসিতে পারিবেন না, লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। খরচপত্র সব আমার নামেই পাঠাইতে লাগিলেন। বাটীর অশান্তি কাজেই দিনদিন বাড়িয়াই চলিল।

পূজার প্রায় পনেরো-দিন পূর্ব্বে বড় বধূর সহসা যেন একটা পীড়া দেখা দিল। তিনি আর ভাল করিয়া আহার করেন না, মাথায় তেল দেন না, ফর্‌সা কাপড় পরেন না।

পূজা আসিল, দাদাও বাড়ী আসিলেন। বড় বধূর পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, মূর্ত্তি মলিন, শরীর কৃশ, গায়ে খড়ি উঠিতেছে, মাথাটা যেন কাকের বাসা।

পূজার কয়দিন কোনরূপে কাটিয়া গেল। একাদশীর দিন প্রাতে, দাদা বাটীস্থ সমস্ত পরিবারবর্গের সাক্ষাতে আমায় বলিলেন, "বিনয়! আর আমাদের একত্র থাকা পোষায় না। তোমার হাতে সংসারের ভার থাকিতে বাড়ীর বড় বধূর পরণে কিনা ছেঁড়া কাপড়, মাথা রুক্ষ,

আর খাওয়া-অভাবে মানুষটি যেন ছ'মাসের রোগী, আমি ত মাসে মাসে মুঠো-মুঠো টাকা পাঠাই, তবে এমন হয় কেন? 'লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা!' এ সব কি সহ্য হয়!" আমি ত অবাক্; পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আসল ব্যাপার বলিতে যাইতেছিলাম, দাদা বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্, আর ঢাকিবার দরকার নাই। ঝির মুখেও সব শুনেছি।"

আমার কথায় দাদার অবিশ্বাস, বড় মর্ম্মাহত হইলাম, চক্ষে জল আসিল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে দাদাকে বলিলাম, "আপনি যাহা ভাল বুঝেন, করুন।" অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

দাদা যে এমন করিবেন, তা যে স্বপ্নের অগোচর! বৌমা, আজ তুমি কোথায়? বেলা ১১টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। দেখি, সব ঠিক্‌ঠাক্। ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র, বিছানা, দাদা সব বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, চুল চিরে ভাগ। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি যা—সবই যে দাদার নামে, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, তিনটি কন্যা গলায় বাঁধা।

ছোট বধূ বিষণ্ণবদনে রাঁধিতেছে, আর ছেলে-মেয়েগুলি তাহার কাছে বসিয়া আছে, সকলেই যেন স্ফূর্ত্তিহীন।

আমিও সেইখানে একটু দূরে বসিলাম।

বড় বধূর আজ বড় ধুমধাম, আজ তাঁহার রন্ধনের আয়োজনই বা কত। সেই ঝি কাছে বসিয়া জোগাড় দিতেছে, আর মাউই-মাকে আনিবার ব্যবস্থাপত্রের খশ্‌ড়া করিতেছে। আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা জানিতে পারিয়াই যেন তাঁহাদের কথোপকথন অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভ হইল। ঝির কি-একটি কথার উত্তরে বড় বধূ বলিলেন, "দেখুক্ এখন—কত জলে কত মুগুরি ভেজে!"

আমি বসিয়া-বসিয়া সব শুনিতেছি, আর কত-কি ভাবিতেছি, এমন-সময় দাদা বাড়ী আসিয়া আমার মেয়ে সুশীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুশু, বৌমার কাছ থেকে একটু তেল আন্‌ত। স্নান করে' আসি।" আমি প্রাতেই স্নান করিতাম। দাদা তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলেন, গামছা মাথাতেই ছিল। "বৌমার কাছ থেকে তেল নিয়ে আয়!"—দাদার আবার একি ছল? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কি?

ভাত প্রস্তুত। ছোট বধূ আমায় আহার করিতে ডাকিলেন। সত্যই আমার কান্না আসিল—"দাদার সহিত পৃথক্ হইয়া খাইতে হইবে?" আমার ছেলের আর আমার দু'খানি আসন পাতা। আমি তখনও কি

ভাবিতেছি; ইতিমধ্যে দাদা স্নান করিয়া আসিলেন; আমারই একখানি কাপড় লইয়া ছাড়িলেন; তার পর, "বিনু, চল খেতে যাই" বলিয়া সেই আসনে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "বৌমা ভাত আন!" আমি ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। দাদার দ্বিতীয় ডাকে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ আহারে বসিলাম। দাদা বেশ্ হাসিতে হাসিতে অন্য দিনের মত গল্প করিতে করিতে আহার শেষ করি-লেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, "দাদার একি কাণ্ড!"

ঝি আমার সহিত দাদাকে আহার করিতে দেখিয়া গিয়া বড় বধূঠাকুরাণীকে সংবাদ দিল। ভীমমূর্ত্তি বড়বধূ তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই ত গালে হাত দিলেন। তার পর, কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, দাদা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌চ? তোমার ভিন্ন হতে বড় সাধ, তাই তোমাকে ভিন্ন করে' দিলাম। আমি আর বিনু কি ভিন্ন?"

আনন্দে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল,—তবে দাদা আমার সেই দাদাই আছেন।

ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিল। বড়বধূর মেজাজ যেন কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল। সে ঝি কিন্তু বিদায় পাইল।

হেমের অনধিকার।

আগ্রা কলেজের প্রফেসর সত্যেন্দ্রের দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। মানবদুর্লভ স্বাস্থ্য, দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্য, লোকবাঞ্ছিত যশ, প্রয়োজনাধিক অর্থ, মনোমোহিনী প্রণয়শালিনী প্রিয়বাদিনী পত্নী, সাক্ষাৎকুমারসদৃশ আনন্দপ্রতিম সুকুমার শিশুপুত্র, সর্ব্বোপরি অন্তরে অনাবিল আনন্দ,—সত্যেন্দ্রের দিন বড় সুখে কাটিতেছিল। সহসা কোথা হইতে করাল কালের কুলিশকঠিন কর সে সুখের ঘর ভাঙিয়া দিল! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রফুল্লপদ্মিনীপরিশোভিত সরোবরের কমলদলে 'পশিয়া' সে নয়নাভিরাম কান্তি বিদলিত, বিচ্ছিন্ন, বিকৃত করিয়া তুলে, তেমনই সেই নির্দ্দয়, নির্ম্মম, নিষাদহৃদয় কঠোর কৃতান্ত সত্যেন্দ্রের সাধের নিকুঞ্জ বিধ্বস্ত করিয়া দিল!—তাঁহার গৃহের কর্ত্রী, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, সংসারতীর্থের একমাত্র সহযাত্রী সহধর্ম্মিণী সরোজিনীকে সহসা জীবনপথের প্রথম

প্রান্তর হইতে হরিয়া লইল! শরতের জ্যোৎস্নাধবলিত নিশীথে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল! সত্যেন্দ্রের জীবনাকাশ অন্ধকার হইয়া গেল!

কিছু ভাল লাগে না। সত্যেন্দ্রের আর আহারে রুচি নাই, বিলাসে বাসনা নাই, জীবনে স্পৃহা নাই, হৃদয়ে সে স্ফূর্ত্তি, অন্তরে সে শান্তি, দেহে সে বল, কার্য্যে সে উদ্যম আর নাই। জীবনবসন্তে আর সে কুসুম হাসে না, মলয়ানিল বহে না, পাপিয়া ডাকে না, জ্যোৎস্না আর ফুটে না!

কিছু ভাল লাগে না। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, গল্প-আলাপনা, সমাজ কি রাজ্যের আলোচনা, কিছু ভাল লাগে না! শুধু সরোজিনীর স্মৃতিমন্দিরের উদ্‌ঘাটিত দ্বারে একাহারী, গৈরিকবসনধারী, ব্রহ্মচারী সত্যেন্দ্র তদ্গতচিত্তে সেই প্রেমপ্রতিমার ধ্যানধারণায় দিন অতিবাহিত করিতেন। আর কিছুতে সত্যেন্দ্রের মন লাগে না,—শুধু তাঁহারই প্রেম, তাঁহারই প্রসঙ্গ, তাঁহারই কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, কবে কোন্-এক-দিন কি-এক সামান্য কারণে সরোজিনীর মনে ব্যথা দিয়াছিলেন, কবে কোন্-এক-দিন কি অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই বলিয়া সরোজিনী ছলছল নয়নে

'আর কিছু চাহিব না' বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। কবে কোন্ পূর্ণিমার রজনীতে, কলনাদিনী কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণরাধিকার প্রেমপ্রসঙ্গ লইয়া কলহ বাধিয়াছিল ; পুরুষ কি রমণী, কে বেশী ভালবাসিতে পারে, এই তুমুল তর্কে, পুরুষই কঠিন, আর রমণী চিরপ্রেম-শালিনী প্রতিপন্ন করিয়া সরোজিনী গর্ব্ববিস্ফারিতলোচনে সহাস্যবদনে স্বামীর মুখপানে চাহিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। সেই আঁখি, সেই মুখ, সেই প্রেম, সকলই মনে পড়ে। আর সেই দিন "আমি মরিলে তুমি কি কর" বলিয়া সরোজিনী যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে কথাও মনে পড়ে।

নিষ্ঠুর! তাহাই দেখিবার জন্য কি সত্যেন্দ্রকে ছাড়িয়া অনন্তে লুকাইয়া আছ? কি দেখিবে তুমি সরোজিনি, সপ্ত সমুদ্র শুকাইবে, তপ্ত রবিকর সুশীতল হইবে, স্নিগ্ধ সুধাকর অগ্নি বর্ষিবে, তবু সত্যেন্দ্রের প্রতিজ্ঞা টলিবে না! সরোজিনি, সরোজিনি, সত্যেন্দ্রের সরোজিনি, তোমার সত্যেন্দ্র বিশ্বাসহন্তা নহে। এ জীবনে, এ হৃদয়ে সরো-জিনী ভিন্ন আর কেহ স্থান পাইবে না। তবে রমণী কি পুরুষ, কে নিদয় সরোজ? সরোজ কথা কহে না, সে বড়

নিষ্ঠুর! দুই দিনে সে সকলি ভুলিয়াছে,—সে ভালবাসা, সে প্রেম, সরোজিনী সকলই ভুলিয়াছে! রমণী নিদয়!

সত্যেন্দ্রের শোকসন্তপ্ত জীবনে এখন একমাত্র সান্ত্বনা প্রাণাধিক পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। হেমেন্দ্রের কচি মুখে তিনি সরোজিনীরই ছায়া দেখিতে পান, তেমনই সেই কুঞ্চিত-কেশ, তেমনই করুণকোমল আঁখি, তেমনই মধুর কোকিল-কণ্ঠ! হেমেন্দ্রনাথই এখন সত্যেন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন একত্রে আহার, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে শয়ন, সত্যেন্দ্র এখন সহজে মুহূর্ত্তের জন্য হেমেন্দ্রকে কাছছাড়া করিতে চান না। সেই মাতৃহারা শিশু সারারাত্রি তাঁহারই তপ্ত বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, ঘুমাইতে ঘুমাইতে "মা, মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, আবার ঘুমাইয়া পড়ে। শিশু যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ "বাবা, পাখী কেন ডাকে," "জল কেন পড়ে," "হাতীর কেন অত বড় শুঁড়," "ঘোড়া হাতীর চেয়ে ছোট কেন," "দাইয়ের ছেলেটা বড় দুষ্টয়া, "পাঁড়ে খালি বকে," "সাহেবের রং শাদা," অজস্র এইরূপ অসম্বদ্ধ অর্থহীন প্রশ্ন করে, আর হাঁফাইয়া হাঁফাই" আধ-আধ স্বরে কত কথা কয়। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র গল্পভাণ্ড হইতে প্রত্যহই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পগুলি পিতাকে

উপহার দেয়। সত্যেন্দ্র আবিষ্টমনে, বিরক্তিশূন্যচিত্তে তাহার সকল কথার উত্তর দেন, সকল গল্প শুনেন, আর নিজেও তাহাকে ছোট ছোট মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলেন। শিশু বেশ্ নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনিতে শুনিতে সহসা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠে—"বাবা, মা কোথায় ?" তখন তাহাকে শান্ত করা সত্যেন্দ্রের কঠিন হইয়া উঠে।

ক্রমে বালক হেমেন্দ্রের এমনই অভ্যাস হইয়া পড়িল যে, বাপের সহিত একাসনে বসিয়া না খাইলে তাহার আর খাওয়া হয় না, বাপের কোলে না শুইলে আর ঘুম আসে না, এমন কি, অধিকক্ষণ তাঁহার কাছছাড়া হইয়া থাকিতেও হেমের কষ্ট হয়। সত্যেন্দ্র যতক্ষণ কলেজে থাকেন, ততক্ষণ সে 'একবার ঘর, একবার বাহির' করিয়া বেড়ায়। যে দাই তাহাকে অতি শৈশব হইতে মানুষ করিয়া আসিতেছে, সে-ও ধরিয়া রাখিতে পারে না। সত্যেন্দ্রের যেই আসিবার সময় হয়, অমনি হেমেন্দ্র পথ 'আগুলিয়া' দাঁড়াইয়া থাকে। পিতাকে দূরে আসিতে দেখিয়া, এক-মুখ হাসিয়া, "বাবা এসেছে রে" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া পিতার হাত-দুইখানি ধরে। তার পর হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে পিতার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে স্বীয় জীবন-

ইতিহাসে যে কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে বলিতে এবং আরও কত 'আবল্‌তাবল্‌' বকিতে বকিতে গৃহে ফেরে। দৈবে, যদি কোনদিন সত্যেন্দ্রের প্রত্যাগমনে কিছু বিলম্ব ঘটে, তবেই সর্ব্বনাশ! হেম তখন নানা বাহানা ধরে, নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাটাও বুঝি মনে পড়ে, তখন বালক ধূলায় পড়িয়া, পা আছড়াইয়া 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চক্ষের জলে কঠিন ধরাকে আর্দ্র করিয়া দেয়। তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া, শেষ বাবুকে ডাকিতে লোক ছুটে। সত্যেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া যখন ধূলিলুণ্ঠিত রোরুদ্যমান শিশুকে বুকে তুলিয়া লন, তখনও সে তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া দু'টি হাতে গলাটি জড়াইয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদে। সত্যেন্দ্র কত মিষ্ট কথায় শিশুকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করেন। শিশু যখন শান্ত হয়, তখন, "বাবা তুমি দেরি কল্লে কেন," "আমার বড় মন কেমন কচ্ছিল," ইত্যাদি কত রকমের অনুযোগ ও আব্দার করে। সত্যেন্দ্রও তাহার পর আর পারতপক্ষে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব করেন না।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। এক মাস, দুই মাস,

তিন মাস অতীত হইয়া গেল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সকলে সত্যেন্দ্রকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রের শোকসাগরের প্রবল তরঙ্গে সে সকল তৃণের মত ভাসিয়া গেল! প্রথম-প্রথম আত্মীয়-বন্ধু বিবাহের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে সত্যেন্দ্রের অধরপ্রান্তে, কালো মেঘের কোলে ক্ষীণ বিদ্যুতের মত, বিষাদমাখা একটু হাসির রেখা দেখা দিত; সে হাসি যে দেখিত, সে আর সহজে এরূপ অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ক্রমে সে দিন গেল, তখন কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সত্যেন্দ্র ঘোর তর্কযুদ্ধ বাধাইয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ যে কোনপ্রকারেই উচিত নহে, সে বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণের অব্যর্থ শাণিত-অস্ত্রপ্রয়োগে প্রতিপক্ষকে জরজর করিয়া দিতেন; এবং মনে মনে ভারি-একটা আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেন।

আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল, এখন কেহ বিবাহের কথা তুলিলে সত্যেন্দ্র আর তেমন তর্ক করেন না, কেবল হিন্দুবিধবার কথা তুলিয়া—

পুরুষ দু'দিন পরে
আবার বিবাহ করে,

অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে",—

বলিয়া আক্ষেপ করেন। আর বলেন—

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ্ !"

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন case hopeless বুঝিয়া বিবাহের জন্য সত্যেন্দ্রকে আর অনুরোধ করেন না। এখন কেবল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুল মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রের শান্তিভঙ্গ করেন!

তবু সত্যেন্দ্র শূন্যমনে শূন্য গৃহে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সংসারধর্ম্মে তাঁহার আর স্পৃহা নাই, তবে এখন কি-একটা অভাবে মনটা কেমন খাঁখাঁ করে। আধখানা প্রাণ আর আধখানার জন্য মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

ছেলেটির জন্যই সত্যেন্দ্রের যত চিন্তা। তাহার হৃদয় বুঝিয়া প্রাণপণে কে এই প্রাণাধিক শিশুসন্তানের যত্ন করিবে? কাহার উপর ভার দিয়া তিনি শিশুর এ দৃঢ় মায়াপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন?

দিন যায়, কিন্তু পত্নীশোক ভুলা যায় না। দিনে দিনে সত্যেন্দ্রের শোকসিন্ধু উদ্বেলিত হইতে লাগিল, শেষ আর বাধাবিপত্তি না মানিয়া দুকূল ভাসাইয়া গেল। এতদিন

সত্যেন্দ্র আপনার রুদ্ধ হৃদয়ের শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না,—পদ্য এবং গদ্য কাব্যের আকারে সে শোকোচ্ছ্বাস সবেগে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। এতদিনে মৃতপত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের গুরুভার সত্যেন্দ্রের স্কন্ধ হইতে কতকটা নামিয়া গেল। যে শোক-প্রবাহ এতদিন সত্যেন্দ্রের দীর্ণহৃদয়ের জীর্ণদ্বারে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছিল, আজ যেন তাহা কাব্যাকারে রুদ্ধদ্বারের গুপ্ত ছিদ্রপথে সবেগে বাহির হইয়া গেল।

পত্নীশোকবিধুর কাব্যকারের প্রতি বিধাতার বুঝি অভিসম্পাত আছে! সুতরাং বিপত্নীকসুলভ বিড়ম্বনা সত্যেন্দ্রের অদৃষ্টেও ঘটিল! বৃদ্ধা জননীর নিতান্ত অনুরোধে এবং ছেলেটির দুঃখনিবারণার্থ ও সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধনরজ্জু হইতে কতকটা মুক্ত হইতেও বটে, সত্যেন্দ্র, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে, বাধ্য হইয়া এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী কিশোরীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। হেম-বন্ধন শিথিল করিতে সত্যেন্দ্র বুঝি প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ হইলেন! নব-পরিণীতা পত্নীর হাসিটি, চাহনিটি, এমন কি কণ্ঠস্বরটিও যেন প্রথমারই মত! And such was she—এই সেই!

সূচী।

চিত্র-বিচিত্র

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

প্রণীত।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—মজুমদার লাইব্রেরী হইতে

শ্রীঅমূল্যনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৯

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি আমার সংসারে আশ্রয়, জীবনে আদর্শ, শিক্ষায় গুরু, স্নেহে সহোদর, আমার সেই—

গুরুদেব

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে

ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা।
১৫ই শ্রাবণ
১৩০৯।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

দুই-একটি কথা।

চিত্র-বিচিত্রের চিত্রগুলি ইতিপূর্ব্বে 'সাধনা', 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'উৎসাহ' ও নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' আমার স্বনামী ও বেনামী বাহির হইয়াছিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেই চিত্রগুলি 'এল্‌বাম্'-ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইল। চিত্রগুলি যে যথাযথ হইয়াছে, এ বিশ্বাস আমার নাই; বরং আমার আশঙ্কা, আমি শিব গড়িতে গিয়া অক্ষমতাবশত হয় ত অন্য-কিছু গড়িয়া ফেলিয়াছি। যাই হোক্, আশা করি, আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া পাঠকগণ আমার এ ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

এই গ্রন্থের অন্যতম চিত্র 'ব্যারিষ্টার' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এ চিত্রটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, 'ভারতীতে' ঠিক সে ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীর তখনকার সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত আকারে সেটি

ভারতীতে প্রকাশিত করেন। ব্যারিষ্টারের চালচলন ও ঘরের কথা আমার চেয়ে তাঁর জানিবার সুবিধা অনেক বেশী। তাঁহার সুনিপুণ হস্তে আমার 'ব্যারিষ্টারের" অসম্পূর্ণতা বোধ হয় কতক অপগত হইয়াছিল। আজ আমার সে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর। এবারেও ব্যারিষ্টারের কতক অংশ পরিবর্ত্তিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইল।

'চিত্র-বিচিত্রে' অন্যান্য চিত্রগুলি প্রথমে যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, প্রায় সেই ভাবেই প্রকাশিত করিলাম। এ পুস্তকে বাংলাভাষার ব্যবহারের অনুরোধে স্থানে স্থানে দুই-একটি ব্যাকরণদুষ্ট পদও প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। কারণ আমার বিশ্বাস, ব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। ভাগীরথীর প্রবাহের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ঐরাবতও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

লেখক।